গবেষণা সিরিজ-৩

কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী

নামাজ কেন আজ ব্যর্থ হচ্ছে

প্রফেসর ডাঃ মোঃ মতিয়ার রহমান
F.R.C.S (Glasgow)

কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী

নামাজ কেন আজ ব্যর্থ হচ্ছে

প্রফেসর ডাঃ মোঃ মতিয়ার রহমান

F.R.C.S (Glasgow)

জেনারেল ও ল্যাপারোসকপিক সার্জন

প্রফেসর অব সার্জারী

ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

ঢাকা, বাংলাদেশ।

www.pathagar.com

প্রকাশক

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন
৩৬৫ নিউডিওএইচএস
রোড নং ২৮, মহাখালী
ঢাকা, বাংলাদেশ
Web site: revivedislam.com

প্রকাশকাল

১ম মুদ্রণ : মার্চ ১৯৯৯
২য় সংস্করণ : জুন ২০০০
৮ম সংস্করণ : সেপ্টেম্বর ০৭
৯ম মুদ্রণ : নভেম্বর ০৮

কম্পিউটার কম্পোজ

আম্মারুস কম্পিউটার
যোগাযোগ: ০১৯১৭০১৭৮৯২

মুদ্রণ ও বাঁধাই

দেশ প্রিন্টার্স
১০ জয়চন্দ্র ঘোষ লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা
ফোন : ৭১২২৮৬৫
০১৭১২-১২৬০৫৮

মূল্য ৩৬.০০ টাকা

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা নং

১. ডাক্তার হয়েও কেন এ বিষয়ে কলম ধরলাম ৩
২. পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ- ৭
❖ আল-কুরআন ৭
❖ সুন্নাহ ৮
❖ বিবেক-বুদ্ধি ৯
৩. সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে যে কর্মপদ্ধতি অনুযায়ী উৎসসমূহ বইটিতে ব্যবহার করা হয়েছে ১৪
৪. নামাজের উদ্দেশ্য এবং পুস্তিকার নামকরণের যথার্থতা ১৬
৫. নামাজের গুরুত্ব ১৭
৬. নামাজ ব্যর্থ হওয়ার কারণ সম্পর্কে বিবেক-বুদ্ধির রায় ১৭
৭. বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী নামাজ কায়েম করা' কথাটির অর্থ ২১
৮. আল-কুরআন অনুযায়ী নামাজ কায়েম করা কথাটির অর্থ ২১
৯. হাদীস অনুযায়ী 'নামাজ কায়েম করা' কথাটির অর্থ ২৭
১০. নামাজের শিক্ষার শ্রেণীবিভাগ ৩০
১১. ব্যক্তি জীবনের জন্যে নামাজের অনুষ্ঠান থেকে শিক্ষা ৩১
১২. সমাজ জীবনের জন্যে নামাজের অনুষ্ঠান থেকে শিক্ষা ৩৫
১৩ নামাজের পঠিত বিষয় থেকে শিক্ষা ৫৪
১৪. সূরা ফাতেহা পড়া থেকে শিক্ষা ৫৫
১৫. সূরা ফাতেহা বাদে কুরআনের অন্য অংশ পড়া থেকে শিক্ষা ৬০
১৬. নামাজে পড়া আসবাহ থেকে শিক্ষা ৬৩
১৭. শিরকের প্রকারভেদ ৬৪
১৮. কালেমা, নামাজ, রোজা, হজ্জ ও যাকাত নামের উপাসনামূলক ইবাদাতগুলো এবং মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্যের মধ্যে সম্পর্ক ৬৭
১৯. আনুষ্ঠানিক উপাসনাগুলোর মধ্যে নামাজকে অনেক বেশি গুরুত্ব দেয়ার কারণ ৬৯
২০. শেষ কথা ৭০

www.pathagar.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ডাক্তার হয়েও কেন এ বিষয়ে কলম ধরলাম

শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দ,

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আমি একজন ডাক্তার (বিশেষজ্ঞ সার্জন)। আপনাদের মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, ডাক্তারি বিষয় বাদ দিয়ে একজন ডাক্তার কেন এ বিষয়ে কলম ধরল? তাই এ বিষয়ে কেন কলম ধরেছি, সেটা প্রথমে আপনাদের জানানো দরকার।

ছোটবেলা থেকেই ইসলামের প্রতি আমার গভীর আগ্রহ ছিল। তাই দেশে-বিদেশে যেখানেই গিয়েছি, ইসলাম সম্বন্ধে সে দেশের মুসলিম ও অমুসলিমদের ধারণা গভীরভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছি। বিলাত থেকে ফিরে এসে আমার মনে হল, জীবিকা অর্জনের জন্যে বড় বড় বই পড়ে MBBS ও FRCS ডিগ্রী করেছি, এখন যদি পবিত্র কুরআন তাফসীরসহ বুঝে না পড়ে আল্লাহর কাছে চলে যাই, আর আল্লাহ যদি জিজ্ঞাসা করেন, 'ইংরেজি ভাষায় বড় বড় বই পড়ে বড় ডাক্তার হয়েছিলে কিন্তু তোমার জীবন পরিচালনার পদ্ধতি জানিয়ে আরবীতে আমি যে কিতাবটি (কুরআন শরীফ) পাঠিয়েছিলাম, সেটি কি তরজমাসহ বুঝে পড়েছিলে? তখন এ প্রশ্নের আমি কী জবাব দেব?'

এ উপলব্ধিটি আসার পর আমি কুরআন শরীফ তাফসীরসহ বুঝে পড়তে আরম্ভ করি। শিক্ষা জীবনের শুরুতে মাদ্রাসায় পড়ার কারণে আগে থেকে আরবী পড়তে ও লিখতে পারতাম। এরপর ইরাকে ৪ বছর রোগী ও সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলতে বলতে আরবী বলা ও বুঝার অভাবটা অনেকাংশে দূর হয়ে যায়।

কুরআন শরীফ পড়তে যেয়ে দেখি, ইরাকে যে সব সাধারণ আরবী বলতাম, তার অনেক শব্দই ওখানে আছে এবং আমি তা বুঝতে পারি। তাই কুরআন শরীফ পড়তে বেশ মজা পেয়ে যাই। পেশা নিয়ে সারাক্ষণ আমাকে ব্যস্ত থাকতে হয়। কিন্তু এর মধ্যেও সময় করে দিনে ১, ২, ৫, ১০ আয়াত বা যতটুকু পারা যায়, বিস্তারিত তাফসীরসহ কুরআন শরীফ পড়তে থাকি। সার্জারি বই যেমন গভীরভাবে বুঝে পড়েছি, কুরআনের প্রতিটি লাইনও সেভাবে বুঝে পড়ার চেষ্টা করেছি। ব্যাখ্যার জন্যে কয়েকখানা তাফসীর দেখেছি। এভাবে সম্পূর্ণ কুরআন শরীফ শেষ করতে আমার প্রায় তিন বছর সময় লাগে।

www.pathagar.com

পুরো কুরআন শরীফ তথা ইসলামের প্রথম স্তরের সকল মৌলিক বিষয়সহ আরো অনেক বিষয় জানার পর আমি ভীষণ অবাক হয়ে গেলাম, ইসলাম সম্বন্ধে কুরআনের বক্তব্য আর সাধারণ মানুষের ধারণার মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য দেখে।

এ ব্যাপক পার্থক্যই আমার মধ্যে এ ব্যাপারে কলম ধরার দায়িত্ববোধ জাগিয়ে দিচ্ছিল। সর্বোপরি, কুরআনের এই আয়াত আমাকে লিখতে বাধ্য করল।

إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُوْنَ بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلاً ۙ أُولٰئِكَ مَا يَأْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ إِلاَّ النَّارَ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيْهِمْ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ.

অর্থ: 'নিশ্চয়ই যারা, আল্লাহ (তাঁর) কিতাবে যা নাযিল করেছেন তা গোপন করে এবং বিনিময়ে অল্প মূল্য গ্রহণ করে, তারা যেন পেট আগুন দিয়ে ভরে। আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না এবং তাদের পবিত্রও করবেন না। আর তাদের জন্যে রয়েছে কঠিন শাস্তি।' (২, বাকারা : ১৭৪)

ব্যাখ্যা: আল্লাহ বলছেন, তিনি কুরআনে যে সব বিধান নাযিল করেছেন, জানা সত্ত্বেও যারা সেগুলো বলে না বা মানুষকে জানায় না এবং এর বিনিময়ে সামান্য কিছু পায় অর্থাৎ সামান্য ক্ষতি এড়াতে তথা ছোট ওজরের কারণে এমনটি করে, তারা যেন তাদের পেট আগুনে ভরলো। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না (ঐ দিন এটি একটি সাংঘাতিক দুর্ভাগ্য হবে) এবং তাদের পবিত্র করা হবে না (অর্থাৎ তাদের ছোট-খাট গুনাহও মাফ করা হবে না। কিয়ামতের দিন আল্লাহ মানুষের ছোট-খাট গুনাহ মাফ করে দিবেন। কিন্তু যারা কুরআন জেনে তা গোপন করবে, তাদের তা করা হবে না)। তাদের জন্যে রয়েছে কঠিন শাস্তি।

তাই কুরআন জেনে তা মানুষকে না জানানোর জন্যে কিয়ামতে যে কঠিন অবস্থা হবে, তা থেকে বাঁচার জন্যে আমি ডাক্তার হয়েও এ বিষয়ে কলম ধরেছি।

www.pathagar.com

লেখার সিদ্ধান্ত নেয়ার পর কুরআনের বক্তব্যগুলোকে কিভাবে উপস্থাপন করা যায়, এটা নিয়ে দ্বন্দ্বে পড়ে গেলাম। এমতাবস্থায় সূরা আরাফের ২নং আয়াতটি আমার মনে পড়ল। আয়াতটি হচ্ছে–

كِتَابٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِتُنْذِرَ بِهِ .

অর্থঃ এটা (আল-কুরআন) একটি কিতাব। এটি তোমার ওপর নাযিল করা হয়েছে এ জন্যে যে, এর বক্তব্য দ্বারা তুমি মানুষকে সতর্ক করবে, ভয় দেখাবে। তাই (কুরআনের বক্তব্য দিয়ে মানুষকে সতর্ক করার ব্যাপারে) তোমার অন্তরে যেন কোন প্রকার দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদি না আসে।

ব্যাখ্যাঃ কুরআনের বক্তব্য দিয়ে মানুষকে সতর্ক করার সময় সাধারণ মানুষের অন্তরে দুটো অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে–

১. কুরআনের বক্তব্য সঠিকভাবে বুঝতে না পারার কারণে মনে সন্দেহ বা দ্বিধা দেখা দিতে পারে। এ অবস্থা অপেক্ষাকৃত কম।
২. বক্তব্য বিষয়টি যদি সমাজের প্রচলিত ধারণার সঙ্গে অসামঞ্জস্যশীল বা বিপরীত হয়, তবে প্রতিরোধ বা বিরোধিতার সম্মুখীন হওয়া অথবা বেতন, দান-খয়রাত বা নজর-নিয়াজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় হতে পারে। এ অবস্থাটি খুবই বিরাজমান।

এ দুই অবস্থাকে (বিশেষ করে ২য়টিকে) এড়ানোর (Overcome) জন্যে সাধারণ প্রবণতা হচ্ছে, কুরআনের যে বক্তব্যগুলো সমাজের প্রচলিত ধারণার বিপরীত, সেগুলোকে লুকিয়ে ফেলা অথবা তার বক্তব্যকে এমনভাবে ঘুরিয়ে বলা, যাতে বিরোধিতা কম আসে বা সবার জন্যে তা গ্রহণযোগ্য হয়। এটি বর্তমান বিশ্বের মুসলিমদের দুরবস্থার একটি প্রধান কারণ। কুরআন দিয়ে মানুষকে সতর্ক করার ব্যাপারে এই ভীষণ ক্ষতিকর কর্মপদ্ধতি দুটো সমূলে উৎপাটন করার জন্যে আল্লাহ এই আয়াতে রাসূলের সা. মাধ্যমে মুসলিমদের বলেছেন, মানুষকে সতর্ক করার সময় দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদির মধ্যে পড়ে তোমরা কখনই কুরআনের বক্তব্যকে লুকাবে না বা ঘুরিয়ে বলবে না।

কুরআনের অন্য জায়গায় (গাশিয়াহঃ ২২, নিসাঃ ৮০) আল্লাহ রাসূলকে সা. বলেছেন, পৃথিবীর সকল মানুষ কখনই কোনো একটি বিষয়ে একমত হবে না।

www.pathagar.com

তাই তুমি কুরআনের বক্তব্য (না লুকিয়ে, না ঘুরিয়ে) মানুষের নিকট উপস্থাপন করবে। যারা তা গ্রহণ করবে না, তাদের তা গ্রহণ করতে বাধ্য করার জন্যে পুলিশের ন্যায় কাজ করা তোমার কাজ নয়। কুরআনের এই সব বক্তব্য জানার পর আমি সিদ্ধান্ত নেই, আমার কথা বা লেখনীতে কুরআনের বক্তব্য না লুকিয়ে, না ঘুরিয়ে সরাসরি উপস্থাপন করব।

কুরআন শরীফ পড়া শেষ করেই আমি লিখতে চেয়েছিলাম কিন্তু হাদীস না পড়ে কলম ধরতে মন চাইল না। তাই আবার হাদীস পড়তে আরম্ভ করি। হাদীস, বিশেষ করে মেশকাত শরীফ (যেখানে সিয়াহ্ সিত্তার প্রায় সমস্ত হাদীস এবং তার বাইরেরও অনেক হাদীসের বর্ণনা আছে) বিস্তারিত পড়ার পর আমি লেখা আরম্ভ করি। বর্তমান লেখা আরম্ভ করি ২৮.০৪.১৯৯৮ তারিখে।

এই পুস্তিকা বাস্তবে রূপ দান করার ব্যাপারে অনেকেই, বিশেষ করে 'কুরআনিআ' (কুরআন নিয়ে উন্মুক্ত আলোচনা) অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী সম্মানিত ভাই ও বোনেরা নানাভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন। আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে দোয়া করি, তিনি যেন এ কাজকে তাদের নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন।

নবী-রাসূল আ. বাদে পৃথিবীতে আর কেউ ভুল-ভ্রান্তির উর্ধ্বে নয়। তাই আমারও ভুল হতে পারে। শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দের নিকট অনুরোধ, যদি এই লেখায় কোনো ভুল-ত্রুটি ধরা পড়ে, আমাকে জানালে কৃতজ্ঞ থাকব এবং সেটি সঠিক হলে, পরবর্তী সংস্করণে তা ছাপানো হবে ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ যেন আমার এ সামান্য খেদমত কবুল করেন এবং এটিকে পরকালে নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন–এ প্রার্থনা করে এবং আপনাদের দোয়া চেয়ে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ!

ম. রহমান

www.pathagar.com

পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ

ইসলামী জীবন বিধানে যে কোন বিষয়ে তথ্যের আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটি– আল-কুরআন, সুন্নাহ ও বিবেক-বুদ্ধি। পুস্তিকার জন্যে এই তিনটি উৎস থেকেই তথ্য নেয়া হয়েছে। তাই চলুন প্রথমে উৎস তিনটি সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা জেনে নেয়া যাক, যা কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসতে মাধ্যম তিনটিকে যথাযথভাবে ব্যবহারের ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ-

ক. আল-কুরআন

কোন কিছু পরিচালনার মৌলিক বিষয়সমূহের নির্ভুল উৎস হচ্ছে ঐটি, যা তার সৃষ্টিকারক বা প্রস্তুতকারক লিখে দেন। লক্ষ্য করে থাকবেন, আজকাল ইঞ্জিনিয়াররা কোন জটিল যন্ত্র বানিয়ে বাজারে ছাড়লে তার সঙ্গে ঐ যন্ত্রটা চালানোর মৌলিক বিষয়গুলো সম্বলিত একটা বই বা ম্যানুয়াল পাঠান। ইঞ্জিনিয়াররা ঐ কাজটা এ জন্যে করেন যে, ভোক্তারা যেন ঐ যন্ত্রটা চালানোর মৌলিক বিষয়ে ভুল করে চরম দুর্ভোগে না পড়ে। এই বুদ্ধিটা ইঞ্জিনিয়াররা পেয়েছে মহান আল্লাহ থেকে। আল্লাহই মানুষ সৃষ্টি করে দুনিয়ায় পাঠানোর সময় তাদের জীবন পরিচালনার মৌলিক বিষয়াবলী সম্বলিত ম্যানুয়াল বা কিতাব সঙ্গে পাঠিয়ে এ ব্যাপারে প্রথম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। এটা আল্লাহ এ জন্যে করেছেন যে, মানুষ যেন তাদের জীবন পরিচালনার মৌলিক বিষয়গুলোতে ভুল করে দুনিয়া ও আখিরাতে চরম দুর্ভোগে না পড়ে। আল্লাহর ঐ কিতাবের সর্বশেষ সংস্করণ হচ্ছে আল-কুরআন। আল্লাহর এটা ঠিক করা ছিল যে, রাসূল মুহাম্মদ সা. এর পর আর কোন নবী-রাসূল আ. দুনিয়ায় পাঠাবেন না। তাই তাঁর মাধ্যমে পাঠানো আল-কুরআনের বিষয়গুলো যাতে রাসূল সা. দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পর, সময়ের আবর্তে, মানুষ ভুলে না যায় বা তাতে কোন কমবেশি না হয়ে যায়, সে জন্যে কুরআনের আয়াতগুলো নাযিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লিখে ও মুখস্থ করে রাখার ব্যবস্থা তিনি রাসূলের সা. মাধ্যমে করেছেন। তাই শুধু আজ কেন, হাজার হাজার বছর পরেও যদি মানুষ তাদের জীবন পরিচালনার সকল প্রথম স্তরের মৌলিক বিষয় নির্ভুলভাবে জানতে চায়, তবে কুরআন শরীফ বুঝে পড়লেই তা জানতে পারবে।

যে সকল বিষয়ের উপরে কুরআনে একাধিক আয়াত আছে ঐ সব বিষয়ের ব্যাপারে সিদ্ধান্তে আসার নিয়ম হচ্ছে, সব ক'টি আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে (Final) সিদ্ধান্তে আসা। কারণ, পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা

www.pathagar.com

করে কোন বিষয়ের একটা দিক এক আয়াতে এবং আর একটা দিক অন্য আয়াতে উপস্থাপন করা হয়েছে অথবা একটি আয়াতে বিষয়টি সংক্ষিপ্তভাবে এবং অন্য আয়াতে তা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এ জন্যেই ইবনে তাইমিয়া, ইবনে কাসীর প্রমুখ মনীষী বলেছেন, কুরআনের তাফসীরের সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে কুরআনের তাফসীর কুরআন দ্বারা করা। তবে এ পর্যালোচনার সময় বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে, একটি আয়াতের তরজমা বা ব্যাখ্যা যেন অন্য আয়াতের তরজমা বা ব্যাখ্যার সঙ্গে সঙ্গতিশীল হয়, বিরোধী না হয়। কারণ, সূরা নাহলের ৫২ নং আয়াতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন কুরআনে পরস্পরবিরোধী কোন কথা নেই।

আলোচ্য বিষয়টির ব্যাপারে কুরআনে বিভিন্ন তথ্য আছে। আল-কুরআনের সেই তথ্যগুলোকে আমি এই পুস্তিকার তথ্যের মূল উৎস হিসাবে গ্রহণ করেছি।

খ. সুন্নাহ

কুরআনের বক্তব্যগুলোর বাস্তব রূপ হল রাসূল সা. এর জীবনচরিত বা সুন্নাহ। তাই কুরআনের বিভিন্ন আয়াত দ্বারা যদি কোন বিষয়ে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে না আসা যায়, তবে সুন্নাহর সাহায্য নিতে হবে। সুন্নাহকে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে হাদীসে। এ জন্যে হাদীসকে এই পুস্তকে তথ্যের ২য় উৎস হিসাবে ধরা হয়েছে।

হাদীসের ব্যাপারে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, কোন হাদীসের বক্তব্য যদি কুরআনের কোন বক্তব্যের বিপরীত হয়, তবে নির্দ্বিধায় সেই হাদীসটিকে মিথ্যা বা বানানো হাদীস বলে অথবা তার প্রচলিত ব্যাখ্যাকে ভুল বলে প্রত্যাখ্যান করতে হবে। সে হাদীসের বর্ণনাকারীগণ যতই গুণান্বিত হোক না কেন। কারণ, কুরআনের স্পষ্ট বক্তব্যের বিপরীত কোন কথা বা কাজ রাসূল সা. কোনক্রমেই বলতে বা করতে পারেন না। পক্ষান্তরে কোন হাদীসের বক্তব্য যদি কুরআনের কোন বক্তব্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য হয়, তবে সেই হাদীসটিকে শক্তিশালী হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। তার বর্ণনাকারীগণের মধ্যে কিছু দুর্বলতা থাকলেও।

কুরআনের বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করা ছাড়াও রাসূল সা. আরো কিছু বিষয় বলেছেন, করেছেন বা অনুমোদন দিয়েছেন যা কুরআনে নেই বা সেগুলো কুরআনের কোন বক্তব্যের ব্যাখ্যা বা বাস্তবায়ন পদ্ধতির মৌলিক বিষয়ও নয়। এগুলো হচ্ছে ইসলামী জীবন বিধানের অমৌলিক বা আনুষঙ্গিক বিষয়।

হাদীস থেকেও কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌছাতে হলে ঐ বিষয় বর্ণিত সকল হাদীস পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌছাতে হবে। আর এ

www.pathagar.com

পর্যালোচনার সময় খেয়াল রাখতে হবে শক্তিশালী হাদীসের বক্তব্য দুর্বল হাদীসের বিপরীতধর্মী বক্তব্যকে রহিত (Cancel) করে দেয়।

গ. বিবেক-বুদ্ধি

আল-কুরআনের সূরা ৯১, আশ-শামছের ৭-১০ নং আয়াতে মহান আল্লাহ বলেছেন-

وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰهَا. فَأَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰهَا.قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا.

অর্থঃ শপথ মানুষের মনের এবং সেই সত্তার যিনি তাকে সঠিক গঠনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তাকে ইলহামের মাধ্যমে পাপ ও সৎ কাজের জ্ঞান দিয়েছেন। যে তাকে উৎকর্ষিত করল সে সফল হল। আর যে তাকে অবদমিত করল সে ব্যর্থ হল।

ব্যাখ্যাঃ এখানে প্রথমে আল্লাহ্ জানিয়েছেন তিনি মানুষের মনকে সঠিক গঠনে সৃষ্টি করেছেন। তারপর বলেছেন তিনি ইলহাম তথা অতিপ্রাকৃতিকভাবে ঐ মনকে কোনটি ভুল (পাপ) এবং কোনটি সঠিক (সৎ কাজ) তা জানিয়ে দেন। এরপর বলেছেন যে ঐ মনকে উৎকর্ষিত করবে সে সফলকাম হবে এবং যে তাকে অবদমিত করবে সে ব্যর্থ হবে। মানুষের এই মনকে বিবেক এবং বিবেক নিয়ন্ত্রিত বুদ্ধিকে বিবেক-বুদ্ধি বলে।

আর এই বিবেকের ব্যাপারে রাসূল সা. এর বক্তব্য হচ্ছে-

وَ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلوةُ وَ السَّلاَمُ لِـوَابِصَةَ (رض) جِئْتَ تَسْأَلُ عَنِ الْبِرِّ وَ الاثْمِ ؟ قَالَ نَعَمْ، قَالَ فَجَمَعَ اَصَابِعَهُ فَضَرَبَ بِهَا صَدْرَهُ. وَ قَالَ اسْتَفْتِ نَفْسَكَ وَ اسْتَفْتِ قَلْبَكَ ثَلاَثًا. اَلْبِرُّ مَا اطْمَأَنَّتْ اِلَيْهِ النَّفْسُ وَاطْمَأَنَّ اِلَيْهِ الْقَلْبُ وَالاثْمُ مَا حَاكَ فِى النَّفْسِ وَ تَرَدَّدَ فِى الصَّدْرِ وَاِنْ اَفْتَاكَ النَّاسُ.

অর্থঃ রাসূল সা. ওয়াবেছা রা. কে বললেন, তুমি কি আমার নিকট নেকি ও পাপ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে এসেছো? সে বললোঃ হ্যাঁ। অতঃপর তিনি আংগুলগুলো একত্র করে নিজের হাত বুকে মারলেন এবং বললেন, তোমার নিজের নফস ও অন্তরের নিকট উত্তর জিজ্ঞাসা কর। কথাটি তিনি তিনবার বললেন। তারপর

www.pathagar.com

বললেন, যে বিষয়ে তোমার নফস ও অন্তর স্বস্তি ও প্রশান্তি লাভ করে, তাই নেকী। আর পাপ হলো সেটি, যা তোমার মনে সন্দেহ-সংশয়, খুঁতখুঁত বা অস্বস্তি সৃষ্টি করে। যদিও সে ব্যাপারে মানুষ তোমাকে ফতোয়া দেয়।

(আহমদ, তিরমিজি)

ব্যাখ্যা: হাদীসখানিতে রাসূল সা. স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, মানুষের অন্তর তথা বিবেক যে কথা বা কাজে সায় দেয় বা স্বস্তি অনুভব করে, তা হবে ইসলামের দৃষ্টিতে নেক, সৎ, ভাল বা সিদ্ধ কথা বা কাজ। আর যে কথা বা কাজে মানুষের অন্তর সায় দেয় না বা অস্বস্তি ও খুঁতখুঁত অনুভব করে তা হবে ইসলামের দৃষ্টিতে গুনাহ, খারাপ বা নিষিদ্ধ কাজ।

তবে অন্য হাদীসে উল্লেখ আছে এবং সাধারণভাবে আমরা সকলেও জানি বিবেক পরিবেশ, শিক্ষা ইত্যাদি দ্বারা পরিবর্তিত হয়। তাই বিবেক-বিরুদ্ধ কথা চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করার আগে তা যেমন কুরআন-হাদীস দিয়ে যাচাই করে নিতে হবে তেমনই বিবেক-সিদ্ধ কথা চূড়ান্তভাবে অগ্রাহ্য করার আগেও তা কুরআন-হাদীস দিয়ে যাচাই করে নিতে হবে।

পবিত্র কুরআনে এই বিবেক-বুদ্ধিকে عَقْلَ বলা হয়েছে। এই عَقْلَ শব্দটিকে আল্লাহ- اَفَلاَ تَعْقِلُوْنَ ، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ، لاَ يَعْقِلُوْنَ ، اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ. ইত্যাদিভাবে মোট ৪৯ বার কুরআনে ব্যবহার করেছেন। শব্দটি তিনি ব্যবহার করেছেন প্রধানত ইসলামকে জানা ও বুঝার জন্যে কুরআন ও সুন্নাহের সঙ্গে বিবেক-বুদ্ধিকে যথাযথভাবে ব্যবহার করার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করার জন্যে, না হয় ঐ কাজে বিবেক-বুদ্ধি না খাটানোর দরুন তিরস্কার করার জন্যে।

বিবেক-বুদ্ধি খাটানো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলেই আল্লাহ কুরআনে শব্দটি এতবার উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া এটিকে আল্লাহ কী পরিমাণ গুরুত্ব দিয়েছেন, তা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বুঝা যায় নিম্নের ৩টি আয়াতের মাধ্যমে-

১. সূরা ৮, আনফালের ২২ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন :

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِيْنَ لاَ يَعْقِلُوْنَ.

অর্থ: নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট নিকৃষ্টতম জন্তু হচ্ছে সেই সব বধির-বোবা লোক, যারা জ্ঞান-বুদ্ধিকে কাজে লাগায় না।

২. সূরা ১০, ইউনুস-এর ১০০ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন :

www.pathagar.com

وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لاَ يَعْقِلُوْنَ.

অর্থঃ যারা বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগ করে কাজ করে না, তিনি তাদের উপর অকল্যাণ চাপিয়ে দেন (ভুল চেপে বসে)।

৩. সূরা ৬৭, মুলকের ১০ নং আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেনঃ

وَقَالُوْا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِيْ أَصْحَابِ السَّعِيْرِ.

অর্থঃ জাহান্নামীরা আরো বলবে, যদি আমরা (নবী-রাসূলদের) কথা শুনতাম এবং বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে তা থেকে শিক্ষা নেয়ার চেষ্টা করতাম, তাহলে আজ আমাদের দোযখের বাসিন্দা হতে হত না।

ব্যাখ্যাঃ আয়াতটিতে দোযখের অধিবাসীরা অনুশোচনা করে যে কথা বলবে তা উল্লেখ করা হয়েছে। তারা বলবে, 'আমরা যদি পৃথিবীতে নবী-রাসূলদের তথা কুরআন ও হাদীসের কথা শুনতাম এবং বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে তা থেকে শিক্ষা নেয়ার চেষ্টা করতাম, তবে আজ আমাদের দোযখের বাসিন্দা হতে হতো না।' কারণ বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে কুরআন ও হাদীস থেকে শিক্ষা নেয়ার চেষ্টা করলে তারা ইসলামের নির্ভুল জ্ঞান অর্জন করতে পারত এবং সহজেই বুঝতে পারত যে, কুরআন ও হাদীসের (প্রায় সব) কথা বিবেক-বুদ্ধিসম্মত। ফলে তারা তা সহজে মেনে নিতে ও অনুসরণ করতে পারত। আর তাহলে তাদের দোযখে আসতে হত না। আয়াতটি থেকে বুঝা যায়, কুরআন ও হাদীসের বক্তব্য বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে না বুঝা দোযখে যাওয়ার একটা প্রাথমিক কারণ হবে।

সুধী পাঠক, চিন্তা করে দেখুন, কুরআনের তথা ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো নিয়ে বিবেক-বুদ্ধিকে কাজে লাগানো এবং চিন্তা-গবেষণা করাকে আল্লাহ্ কী অপরিসীম গুরুত্ব দিয়েছেন। এই বিবেক-বুদ্ধি ও চিন্তা-গবেষণার ব্যবহারকে তিনি কোন বিশেষ যুগের মানুষের জন্যে নির্দিষ্ট করে দেননি। কারণ, মানব সভ্যতার অগ্রগতির (Development) সঙ্গে সঙ্গে কুরআনের কোন কোন আয়াতের অর্থ বা ব্যাখ্যা নতুন তথ্যসমৃদ্ধ হয়ে মানুষের নিকট আরো পরিষ্কার হয়ে ধরা দিবে। এ কথাই রাসূল সা. তাঁর দুটো হাদীসের মাধ্যমে এভাবে বর্ণনা করেছেন। প্রথম হাদীসটি অনেক বড়, তাই সংক্ষেপে তা উপস্থাপন করা হল-

১. হযরত আবু বকরা রা. বলেন, নবী করিম সা. ১০ জিলহজ্জ কুরবানির দিনে আমাদের এক ভাষণ দিলেন এবং বললেন, বলো, আমি কি তোমাদেরকে

www.pathagar.com

আল্লাহর নির্দেশ পৌছাই নাই? আমরা বললাম, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ্। তখন তিনি বললেন, 'হে খোদা, তুমি সাক্ষী থাক।' অতঃপর বললেন, 'উপস্থিত প্রত্যেকে যেন অনুপস্থিতকে এ কথা পৌছিয়ে দেয়। কেননা, পরে পৌছানো ব্যক্তিদের মধ্যে এমন অনেক ব্যক্তি আছে, যে আসল শ্রোতা অপেক্ষাও এর পক্ষে অধিক উপলব্ধিকারী ও রক্ষাকারী হতে পারে'। (বুখারী ও মুসলিম) হাদীসটির 'কেননা' শব্দের আগের অংশটুকু বহুল প্রচারিত কিন্তু 'কেননা'র পরের অংশটুকু যে কোন কারণেই হোক একেবারেই প্রচার পায় নাই।

২. 'আল্লাহ ঐ ব্যক্তির মুখ উজ্জ্বল করুন, যে আমার বাণী শ্রবণ করেছে, তা স্মরণ ও সংরক্ষণ করেছে এবং অন্যদের কাছে পৌছে দিয়েছে। জ্ঞানের অনেক বাহক নিজে জ্ঞানী নয়। আবার জ্ঞানের অনেক বাহক নিজের চেয়ে অধিক জ্ঞানীর কাছে তা পৌছে দেয়'।

(তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, দারেমি, বায়হাকি)

মহান আল্লাহ তো কুরআনের বক্তব্যকে চোখ-কান বন্ধ করে মেনে নিতে বলতে পারতেন; কিন্তু তা না বলে তিনি উল্টো কুরআনের বক্তব্যকে বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে বুঝার ব্যাপারে অপরিসীম গুরুত্ব দিয়েছেন। এর প্রধান কয়েকটি কারণ হচ্ছে-

ক. বিবেক-বুদ্ধি সকল মানুষের নিকট সকল সময় উপস্থিত থাকে,

খ. বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহার করে সিদ্ধান্তে পৌছা যেমন সহজ তেমন তাতে সময়ও খুব কম লাগে,

গ. কোন বিষয় বিবেক-সিদ্ধ হলে তা গ্রহণ করা, মনের প্রশান্তি নিয়ে তা আমল করা এবং তার উপর দৃঢ় পদে দাঁড়িয়ে থাকা সহজ হয় এবং

ঘ. অল্প কিছু অতীন্দ্রিয় (মুতাশাবিহাত) বিষয় বাদে ইসলামে চিরন্তনভাবে বিবেক-বুদ্ধির বাইরে কোন কথা বা বিষয় নেই।

তাই, বিবেক-বুদ্ধির রায়কেও এই পুস্তিকার তথ্যের একটি উৎস হিসাবে নেয়া হয়েছে। তবে বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহারের ব্যাপারে অবশ্যই মনে রাখতে হবে-

ক. আল্লাহর দেয়া বিবেক বিপরীত শিক্ষা ও পরিবেশের দ্বারা পরিবর্তিত হয়, তবে একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায় না,

খ. সঠিক বা সম্পূরক শিক্ষা ও পরিবেশ পেলে বিবেক উৎকর্ষিত হয়ে কুরআন-হাদীসের কাছাকাছি পৌছে যায় কিন্তু একেবারে সমান হয় না এবং

গ. কুরআন বা মুতাওয়াতির হাদীসের কোন বক্তব্য যদি মানুষের বর্তমান জ্ঞান অনুযায়ী না বুঝা যায় তবুও তাকে সত্য বলে নিঃসন্দেহে গ্রহণ

www.pathagar.com

করতে হবে। কারণ, কুরআনের বিষয়গুলো কিয়ামত পর্যন্ত প্রযোজ্য। তাই মানুষের জ্ঞান একটি বিশেষ স্তরে না পৌছা পর্যন্ত কুরআনের কোন কোন আয়াতের সঠিক অর্থ বুঝে না-ও আসতে পারে। কয়েকটি উদাহরণ দিলে ব্যাপারটি আরো পরিষ্কার হবে বলে আশা করি।

১. রকেটে করে গ্রহ-উপগ্রহে স্বল্প সময়ে যাওয়ার জ্ঞান আয়ত্তে আসার পর রাসূলের সা. মেরাজ বুঝা ও বিশ্বাস করা সহজ হয়ে গেছে। আল্লাহ তায়ালা বুরাক নামক বাহনে করে 'সিদরাতুল মুনতাহা' পর্যন্ত এবং তারপর 'রফরফ' নামক বাহনে করে আরশে আজিম পর্যন্ত, অতি স্বল্প সময়ে রাসূল সা. কে নিয়ে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করিয়ে আবার দুনিয়ায় ফেরত পাঠিয়েছিলেন।

২. সূরা যিলযাল-এর ৭ ও ৮ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, দুনিয়াতে বিন্দু পরিমাণ ভাল কাজ করলে তা মানুষকে কিয়ামতের দিন দেখানো হবে, আবার বিন্দু পরিমাণ অসৎ কাজ করলে তাও ঐ দিন দেখানো হবে। ভিডিও রেকর্ডিং (Video Recording)-এর জ্ঞান আয়ত্তে আসার আগ পর্যন্ত মানুষের পক্ষে এই 'দেখানো' শব্দটি সঠিকভাবে বুঝা সহজ ছিল না। তাই তাফসীরেও এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা এসেছে। কিন্তু এখন আমরা বুঝতে পারছি, মানুষের ২৪ ঘন্টার কর্মকাণ্ড আল্লাহ তাঁর রেকর্ডিং কর্মচারী (ফেরেশতা) দিয়ে ভিডিও রেকর্ড করে কম্পিউটার ডিসকে (Computer disk) সংরক্ষিত রাখছেন এবং এটিই শেষ বিচারের দিন 'দেখিয়ে' বিচার করা হবে।

৩. মায়ের গর্ভে মানুষের ভ্রূণের বৃদ্ধির স্তর (Developmental steps) সম্বন্ধে কুরআনের যে সকল আয়াত আছে, আগের তাফসীরকারকগণ তার সঠিক তাফসীর করতে পারেন নাই, বিজ্ঞানের উন্নতি ঐ স্তরে না পৌছার কারণে। কিন্তু এখন বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ভ্রূণের বৃদ্ধির (Embryological development) জ্ঞান যতই মানুষের আয়ত্তে আসছে, ততই কুরআনের ঐ আয়াতের বর্ণনা করা তথ্যগুলোর সত্যতা প্রমাণিত হচ্ছে।

৪. কুরআনের সূরা হাদিদে বলা হয়েছে, হাদিদ অর্থাৎ লোহা বা ধাতু (Metal) এর মধ্যে রয়েছে প্রচণ্ড শক্তি। এই 'প্রচণ্ড শক্তি' বলতে আগের তাফসীরকারকগণ বলেছেন তরবারি, বন্দুক, কামান ইত্যাদির শক্তি। কিন্তু এখন বুঝা যাচ্ছে, এটি হচ্ছে পরমাণু শক্তি (Atomic energy)।

www.pathagar.com

বিবেক-বুদ্ধি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে 'পবিত্র কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী বিবেক-বুদ্ধির গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন' নামক বইটিতে।

কিয়াস ও ইজমা

যে সকল বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহে কোন বক্তব্য নেই বা থাকা বক্তব্যের একের অধিক অর্থ বা ব্যাখ্যা করার সুযোগ আছে, সে সকল বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহের অন্য বক্তব্যের সাথে বিবেক-বুদ্ধি মিলিয়ে সিদ্ধান্তে আসাকে কিয়াস (Deduction) বলে। আর কোন বিষয়ে সকলের কিয়াসের ফলাফল এক হওয়া বা কারো কিয়াসের ব্যাপারে সকলের একমত হওয়াকে ইজমা (Concensus) বলে। তাই সহজেই বুঝা যায় কিয়াস বা ইজমা ইসলামের মূল উৎস নয় বরং তা হল আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটি তথা কুরআন, সুন্নাহ ও বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহার করে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসা। অর্থাৎ কিয়াস ও ইজমার মধ্যে কুরআন ও সুন্নাহের সাথে আল্লাহ প্রদত্ত তৃতীয় উৎসটি তথা বিবেক-বুদ্ধিও উপস্থিত আছে।

ইজমাকে ইসলামী জীবন বিধানের একটি দলিল ধরা হলেও মনে রাখতে হবে ইজমার সিদ্ধান্ত অপরিবর্তনীয় নয়। কারণ, মানব সভ্যতার উন্নতির সাথে সাথে কুরআন ও সুন্নাহের ঐ সকল অস্পষ্ট বক্তব্য আরো স্পষ্ট হয়ে উঠবে। এর কয়েকটি উদাহরণ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। বিজ্ঞানের বিষয়ের মত অন্য যে কোন বিষয়ে তা হতে পারে।

সিদ্ধান্তে পৌছাতে যে ক্রমধারা অনুযায়ী উৎসসমূহ বইটিতে ব্যবহার করা হয়েছে

যে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসতে, মূল উৎস তিনটি অর্থাৎ কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহারের ফর্মুলাটি মহান আল্লাহ সার-সংক্ষেপ আকারে জানিয়ে দিয়েছেন সূরা নিসার ৫৯ নং আয়াতে। আর রাসূল সা. ও সুন্নাহের মাধ্যমে সে ফর্মুলাটি ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। ফর্মুলাটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি 'ইসলামে নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের জন্যে কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহারের ফর্মুলা' নামক বইটিতে। তবে ফর্মুলার চলমান চিত্রটি পরবর্তী পৃষ্ঠায় উপস্থাপন করা হল।

www.pathagar.com

ইসলামের নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের জন্যে কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহারের ফর্মুলার চিত্ররূপ

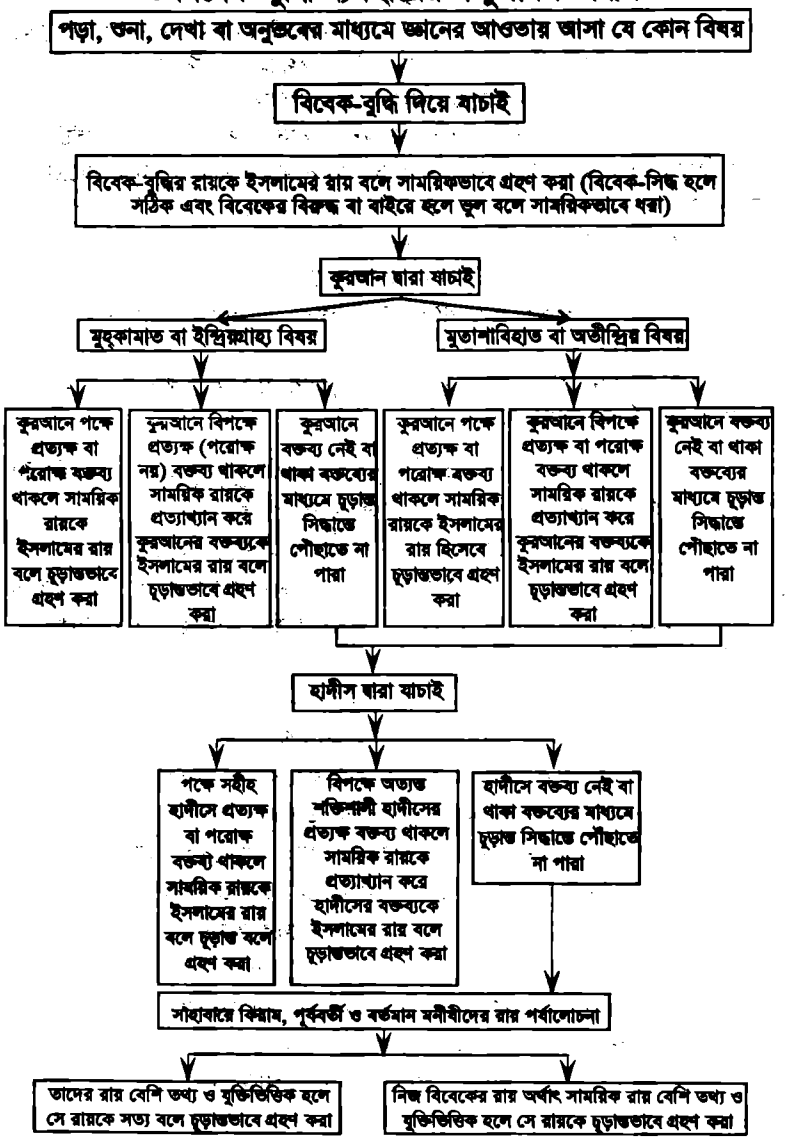

www.pathagar.com

মূল বিষয়

নামাজের উদ্দেশ্য এবং পুস্তিকার নামকরণের যথার্থতা

শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দ, 'নামাজ ব্যর্থ হচ্ছে' কথাটি লেখার জন্যে কেউ কেউ হয়তো আমার উপর রাগ করতে পারেন। তাই প্রথমে এ বিষয়ে আলোচনা করা দরকার। কোন কাজ ব্যর্থ হচ্ছে কিনা, সে ব্যাপারে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হলে সর্বপ্রথম জানা দরকার– ঐ কাজটির উদ্দেশ্য। যদি দেখা যায়, ঐ কাজটি করা হচ্ছে ঠিকই কিন্তু তার উদ্দেশ্য পূরণ হচ্ছে এমন লক্ষণ বাস্তবে দেখা যাচ্ছে না, তাহলে নিঃসন্দেহে বলা যাবে যে, ঐ কাজটি ব্যর্থ হচ্ছে। আশা করি এ ব্যাপারে আপনারা কেউ দ্বিমত পোষণ করবেন না।

তাহলে নামাজ ব্যর্থ হচ্ছে কিনা– এ ব্যাপারে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হলে প্রথমে আমাদের নামাজের উদ্দেশ্যটি জানতে হবে। চলুন, এ ব্যাপারে আল-কুরআন কী বলছে দেখা যাক।

পবিত্র কুরআন শরীফের সূরা আন-কাবুতের ৪৫ নং আয়াতে নামাজের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আল্লাহ বলছেন–

إِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ.

অর্থ: নিশ্চয়ই নামাজ অশ্লীল ও নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত রাখে।

ব্যাখ্যা: আল্লাহ এখানে বলেছেন : নিশ্চয়ই নামাজ, নামাজী ব্যক্তি এবং নামাজীদের সমাজ (যেহেতু ব্যক্তির সমষ্টিই সমাজ) থেকে ইসলামের দৃষ্টিতে অশ্লীল ও নিষিদ্ধ কাজ দূর করে। লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, আল্লাহ তায়ালা নিশ্চয়তা দিয়েই কথাটি বলছেন।

তাহলে এই আয়াতের মাধ্যমে, যে উদ্দেশ্যে আল্লাহ নামাজ ফরজ করেছেন, তা নিশ্চিতভাবে জানা গেল। নামাজের সেই উদ্দেশ্য হচ্ছে, মুসলমানদের ব্যক্তি ও সমাজ থেকে ইসলামের দৃষ্টিতে অশ্লীল ও নিষিদ্ধ কাজ নিশ্চিতভাবে দূর করা।

এবার চলুন দেখা যাক, নামাজের এই উদ্দেশ্য কতটুকু সাধিত হচ্ছে। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হচ্ছে, যত দিন যাচ্ছে আমাদের সমাজে নামাজীর সংখ্যা বাড়ছে কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশি গুণ বাড়ছে ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে অশ্লীল ও নিষিদ্ধ কাজের সংখ্যা। আপনাদের অভিজ্ঞতাও নিশ্চয়ই এর থেকে ভিন্ন হবে না। প্রায় সকল মুসলিম দেশে এই একই অবস্থা।

তাহলে এখন সবাই নিশ্চয়ই একমত হবেন যে, যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে আল্লাহ নামাজ ফরজ করেছেন, মুসলমানদের ব্যক্তি ও সমাজে বর্তমানে নামাজ সে উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ হচ্ছে। অবশ্য দোষ এখানে নামাজের নয়। দোষ নামাজির।

www.pathagar.com

নামাজের গুরুত্ব

ইসলামী জীবন বিধানে নামাজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি আমল বা কাজ। আর নামাজ যে অতীব গুরুত্বপূর্ণ, তা বুঝা যায় নিম্নের তথ্যগুলো থেকে–

১. নামাজ ধনী, গরীব সকলের জন্যে ফরজ। কিন্তু ইসলামের অনেক গুরুত্বপূর্ণ আমল আছে যা সকলের জন্যে ফরজ নয়। যেমন– যাকাত ও হজ্জ শুধু ধনীদের জন্যে ফরজ।

২. ছফরে নামাজ মাফ নাই কিন্তু রোজা মাফ আছে।

৩. অজ্ঞান অবস্থা ছাড়া নামাজ মাফ নাই কিন্তু অজ্ঞানসহ অন্য অসুস্থ অবস্থায় রোজা মাফ আছে।

৪. পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ হওয়ার আদেশ মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় নবীকে আরশে আজীমে ডেকে নিয়ে সরাসরি দিয়েছিলেন। কিন্তু অন্য সকল কাজের আদেশ জিব্রাইল আ. এর মাধ্যমে পাঠিয়েছেন।

৫. নামাজকে রাসূল সা. বেহেশতের চাবি বলে উল্লেখ করেছেন।

নামাজ ব্যর্থ হওয়ার কারণ

পূর্বের আলোচনা থেকে এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া গেছে যে, নামাজ বর্তমানে সাধারণভাবে ব্যর্থ হচ্ছে। এখন যদি নামাজ যে যে কারণে ব্যর্থ হচ্ছে তা শনাক্ত করা যায় এবং মুসলমানরা যদি সে কারণগুলোর প্রতিকার করতে এগিয়ে আসে, তবে নামাজ অবশ্যই আবার তার উদ্দেশ্য সাধনে সফল হবে। যেমন তা হয়েছিল ইসলামের প্রাথমিক যুগে।

চলুন, এ ব্যাপারে বিবেক-বুদ্ধি, কুরআন এবং রাসূল সা. এর সুন্নাহ– এই তিন মাধ্যমের সাহায্যে সিদ্ধান্তে পৌঁছার চেষ্টা করা যাক–

নামাজ ব্যর্থ হওয়ার কারণ সম্পর্কে বিবেক-বুদ্ধির রায়

যে কর্মকাণ্ডের একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য থাকে এবং কর্মকাণ্ডটি করতে গেলে সবাইকে কিছু নির্দিষ্ট কাজ করতে হয়, তাকে আনুষ্ঠানিক কর্মকাণ্ড বলা হয়। যেমন–স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, বিশ্ববিদ্যালয়, সেনাবাহিনী ইত্যাদির শিক্ষা। নামাজেরও একটা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য আছে এবং নামাজ আদায় করতে যেয়ে সবাইকে কিছু নির্দিষ্ট কাজ করতে হয়। যেমন– রুকু, সিজদা, কিয়াম, কিরাত ইত্যাদি। তাই নামাজ একটি আনুষ্ঠানিক ইবাদত বা কাজ।

পৃথিবীতে মানুষ যত আনুষ্ঠানিক কর্মকাণ্ড তৈরি করেছে, সেগুলো সফল করতে হলে নিম্নের ৫টি শর্ত অবশ্যই পূরণ করতে হয়–

প্রথমত: ঐ কর্মকাণ্ডের উদ্দেশ্যটি জানতে হবে।

কারণ উদ্দেশ্যটিকে সামনে না রেখে কাজটি করলে, ঐ উদ্দেশ্য কখনই সাধিত হবে না।

www.pathagar.com

দ্বিতীয়তঃ পাথেয়কে উদ্দেশ্য সাধনের মাধ্যম মনে করে পালন করা।
আনুষ্ঠানিক কর্মকাণ্ডের উদ্দেশ্যটি বাদে আর যত কাজ বা অনুষ্ঠান থাকে তা হচ্ছে ঐ উদ্দেশ্য সাধনের পাথেয়
অর্থাৎ ঐ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে করণীয় কাজ বা কাজসমূহ। কেউ যদি পাথেয়কে কাজটির উদ্দেশ্য মনে করে পালন করে তাহলে কর্মকাণ্ডটির উদ্দেশ্য কখনই সাধিত হবে না।
তৃতীয়তঃ কর্মকাণ্ডটির প্রতি কাজ বা অনুষ্ঠান সঠিক পদ্ধতি বা নিয়ম-কানুন মেনে নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতে হবে।
চতুর্থতঃ কর্মকাণ্ডটির প্রতিটি কাজ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে।
কারণ প্রতিটি কাজ তৈরিই করা হয় কিছু শিক্ষা দেয়ার জন্যে। আর ঐ শিক্ষা গ্রহণ করলেই শুধু এমন লোক তৈরি হয়, যারা কর্মকাণ্ডটির উদ্দেশ্য সাধনের উপযোগী হয়। প্রতিটি কাজ যে যত নিষ্ঠার সঙ্গে করবে এবং তা থেকে যে যত বেশি শিক্ষা গ্রহণ করবে, সে ঐ কর্মকাণ্ডটির উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে তত বেশি উপযোগী হবে। অন্যদিকে কেউ যদি প্রতিটি কাজ খুব নিষ্ঠার সঙ্গে করে কিন্তু তা থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষাগুলো গ্রহণ না করে তবে তাকে দিয়ে কখনই কর্মকাণ্ডটির উদ্দেশ্য সাধিত হবে না।
পঞ্চমতঃ কর্মকাণ্ডটি থেকে নেয়া শিক্ষাগুলো বাস্তবে প্রয়োগ করতে হবে। এটি না করলে কর্মকাণ্ডটির উদ্দেশ্য কখনই সাধিত হবে না।

চলুন এবার একটি উদাহরণের মাধ্যমে ব্যাপারটি আরো একটু ভালো করে বোঝার চেষ্টা করা যাক। মেডিকেল শিক্ষা একটি আনুষ্ঠানিক কর্মকাণ্ড। কারণ মেডিকেল শিক্ষার একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য আছে (মানুষের রোগ নিরাময়ের চেষ্টা করা) এবং প্রতিটি মেডিকেল ছাত্রকে কিছু নির্দিষ্ট কর্মের মাধ্যমে এই কর্মকাণ্ডটি করতে হয়। যেমনঃ লেকচার রুমে গিয়ে শিক্ষকদের লেকচার শোনা, মেডিকেল বই পড়া, লাশ কাটার ঘরে গিয়ে লাশ কাটা, হাসপাতালে গিয়ে রোগী দেখা ইত্যাদি।
এখন মেডিকেল শিক্ষার কর্মকাণ্ডকে যদি প্রতিষ্ঠা বা সফল করতে হয়, তবে যে ৫টি শর্ত পূরণ করতে হবে তা হচ্ছে–
প্রথমতঃ মেডিকেল শিক্ষার উদ্দেশ্য ভালভাবে জানতে হবে।
অর্থাৎ প্রত্যেকটি মেডিকেলের ছাত্রছাত্রীকে প্রথমে এটা ভালভাবে বুঝে নিতে হবে যে, মেডিকেল শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের রোগ ভাল করার চেষ্টা করা। এ উদ্দেশ্য সামনে না রেখে যদি তারা মেডিকেল কলেজে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে শরীক হওয়ার পর ডাক্তার হয়ে বের হয় এবং ডাক্তারী করতে আরম্ভ করে তবে তার দ্বারা মানুষের তো কোন কল্যাণ হবেই না বরং অকল্যাণ হবে প্রচুর। ফলে মানুষ মেডিকেল শিক্ষার প্রতিই খারাপ ধারণা পোষণ করতে শুরু করবে।

www.pathagar.com

দ্বিতীয়তঃ মেডিকেল শিক্ষার পাথেয়কে উদ্দেশ্য সাধনের মাধ্যম মনে করা। মেডিকেল কলেজ, হাসপাতাল, মেডিকেল শিক্ষার বিভিন্ন অনুষ্ঠান, ঔষধ, অপারেশনের যন্ত্রপাতি ইত্যাদি হচ্ছে মেডিকেল শিক্ষার পাথেয়। কোন মেডিকেল ছাত্র যদি পাথেয়গুলোর এক বা একাধিককে উদ্দেশ্য মনে করে মেডিকেল শিক্ষা গ্রহণ করে ডাক্তার হয়, তবে তার দ্বারা মেডিকেল শিক্ষার উদ্দেশ্য কখনই সাধিত হবে না। ঐ পাথেয়গুলোকে মেডিকেল শিক্ষার উদ্দেশ্য সাধনের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করতে হবে।

তৃতীয়তঃ প্রতিটি ছাত্রকে মেডিকেল কলেজের সকল অনুষ্ঠান সঠিক পদ্ধতি তথা নিয়ম-কানুন মেনে নিষ্ঠার সঙ্গে করতে হবে।

চতুর্থতঃ প্রতিটি মেডিকেল ছাত্রকে মেডিকেল কলেজের সকল কর্মকাণ্ড থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে।

যে যত নিষ্ঠার সঙ্গে প্রতিটি কর্মকাণ্ড করে তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে, সে তত ভাল ডাক্তার হবে। অর্থাৎ সে তত ভালভাবে মেডিকেল শিক্ষার উদ্দেশ্য সাধনে সক্ষম হবে। অন্যদিকে কোন মেডিকেলের ছাত্র যদি খুব নিষ্ঠার সঙ্গে কলেজের সব অনুষ্ঠানে শরীক হল কিন্তু তা থেকে কোন শিক্ষা গ্রহণ করল না; যেমন ধরুন সে ক্লাসে সময় মত গেল, বসল এবং শিক্ষকদের লেকচার শুনল কিন্তু বুঝল না, লাশ কাটা ঘরে গিয়ে লাশ কাটল কিন্তু শিক্ষা নিল না, রুগী দেখল কিন্তু তা থেকে শিক্ষা নিল না। এইরূপ ছাত্রছাত্রী যদি ডাক্তারী করতে যায়, তবে তার দ্বারা ডাক্তারী বিদ্যার উদ্দেশ্য সাধনের আশা করাই অন্যায় হবে।

পঞ্চমতঃ শিক্ষাগুলোকে বাস্তবে প্রয়োগ করতে হবে।

কোন মেডিকেল ছাত্রছাত্রী যদি উপরের পাঁচটি শর্ত পূরণ করে কিন্তু বাস্তবে শিক্ষাগুলো প্রয়োগ না করে, তবে তার সমস্ত প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে যাবে। এটিতো দিবালোকের মতই সত্য।

যে কোন আনুষ্ঠানিক কর্মকাণ্ডের ব্যাপারেই উপরের বক্তব্য সত্য। অর্থাৎ উপরে বর্ণিত পাঁচটি শর্ত পূরণ না করে যে কোন আনুষ্ঠানিক কর্মকাণ্ড করলে তা অবশ্যই ব্যর্থ হবে। আর ঐ আনুষ্ঠানিক কর্মকাণ্ডের পরিকল্পনাকারী যদি দেখেন যে, শর্তগুলো পূরণ না করে কাজটি করার দরুন তা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হচ্ছে, তবে যারা কাজটি ঐভাবে করছেন, তাদের উপরে তিনি খুশি হবেন, এটা আশা করাও কি পাগলের প্রলাপ নয়?

সুধী পাঠক,

নামাজও একটি আনুষ্ঠানিক কাজ, আমল বা ইবাদাত। তাই বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী নামাজকে সফল করতে হলে এবং নামাজ আদায়ের নামাজের পরিকল্পনাকারী আল্লাহর সন্তুষ্টি পেতে হলে নিম্নের পাঁচটি শর্ত অবশ্যই পূরণ করতে হবে–

www.pathagar.com

প্রথমত: নামাজের কুরআনে বর্ণিত উদ্দেশ্যটি জানতে হবে। যা আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন সূরা আন কাবুতের ৪৫ নং আয়াতের মাধ্যমে (পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে)

দ্বিতীয়ত: নামাজের অনুষ্ঠানটি হচ্ছে পাথেয়। অর্থাৎ অনুষ্ঠান হচ্ছে নামাজের উদ্দেশ্য সাধনের উপায়। তাই শুধু অনুষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে নামাজকে পালন করা চলবে না।

তৃতীয়ত: নামাজের অনুষ্ঠানটি আল্লাহর জানিয়ে দেয়া ও রাসূল সা. এর দেখিয়ে দেয়া পদ্ধতি বা নিয়ম-কানুন (আরকান-আহকাম) অনুযায়ী নিষ্ঠার সঙ্গে করতে হবে।

চতুর্থত: নামাজের প্রতিটি অনুষ্ঠান থেকে আল্লাহর দিতে চাওয়া শিক্ষাগুলো বুঝে-শুনে মনেপ্রাণে গ্রহণ করতে হবে।

পঞ্চমত: সেই শিক্ষাগুলো নামাজের উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে বাস্তবে প্রয়োগ করতে হবে।

আজ বিশ্ব মুসলমানদের দিকে তাকালে দেখা যায়, তাদের অধিকাংশই উপরোক্ত পাঁচটি শর্ত পূরণ না করেই নামাজের মত আনুষ্ঠানিক ইবাদতটি পালন করছেন। আর তাই নামাজ আজ ব্যর্থ হচ্ছে অর্থাৎ নামাজ তার কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ হচ্ছে। ফলে নামাজের পরিকল্পনা কর্তা মহান আল্লাহও নিশ্চয়ই তাদের উপরে দারুণ অখুশি হচ্ছেন। অর্থাৎ তাদের নামাজ কবুল হচ্ছে না। এ পর্যায়ে এসে সবাই নিশ্চয়ই একমত হবেন যে, নামাজ বর্তমানে ব্যর্থ হওয়ার ব্যাপারে আমাদের বিবেক-বুদ্ধির রায় এটাই।

নামাজ ব্যর্থ তথা কবুল হওয়া না হওয়া সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের বক্তব্য

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ ১৮ বার আদেশ আকারে এবং আরও অনেক বার অন্যভাবে নামাজ কায়েম করার কথা বলেছেন। লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, আল্লাহ নামাজ পড়তে না বলে কায়েম করতে বলেছেন। এই 'কায়েম করা' বাক্যটি দ্বারা আল্লাহ যা বুঝাতে চেয়েছেন, রাসূল সা. যে সঠিকভাবে তাঁর সাহাবীগণকে সেটি বুঝিয়ে দিয়েছিলেন তা বুঝা যায় সাহাবীদের রা. এবং ইসলামের প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক অবস্থা দেখলে। পরবর্তীতে মুসলমানরা এই 'কায়েম করা' কথাটির সঠিক অর্থ হারিয়ে ফেলেছে, এটি নামাজ বর্তমানে ব্যর্থ হওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ।

চলুন এখন নামাজের ন্যায় একটি আনুষ্ঠানিক কাজ বা আমল 'প্রতিষ্ঠা করা' কথাটির কী অর্থ হয় বা হবে সেটি বিবেক-বুদ্ধি, কুরআন ও হাদীসের তথ্যের মাধ্যমে পর্যালোচনা করা যাক—

www.pathagar.com

বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী নামাজ 'কায়েম করা' কথাটির অর্থ

'কায়েম করা' কথাটির অর্থ হচ্ছে, প্রতিষ্ঠা করা। বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী যে কোন আনুষ্ঠানিক কাজ 'প্রতিষ্ঠা করা' কথাটির মাত্র দুটি অর্থ হতে পারে। যথা–

১. কর্মকাণ্ডটির শুধু অনুষ্ঠানটি সঠিক ও সুন্দরভাবে করার ব্যবস্থা সমাজে প্রতিষ্ঠা করা। অর্থাৎ কর্মকাণ্ডটির সকল অনুষ্ঠান নিয়ম-কানুন মেনে কিভাবে করতে হবে তা মানুষকে শিখানো এবং সে অনুষ্ঠান পালন করার জন্যে জায়গা বা ভবন (Building) তৈরি করে সেখানে সে অনুষ্ঠানটি সুন্দরভাবে করার ব্যবস্থা কায়েম বা প্রতিষ্ঠা করা।

২. অনুষ্ঠানটির অনুষ্ঠানগুলো নিয়ম-কানুন মেনে করে তা থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষাগুলো নিয়ে সে শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে প্রতিষ্ঠা বা কায়েম করা।

চিন্তা করে দেখুন, যে কোন আনুষ্ঠানিক কাজ 'প্রতিষ্ঠা করা' কথাটির এর বাইরে অন্য কোন অর্থই হতে পারে না। আর বিবেক-বুদ্ধির চির সত্য (Eternal Truth) রায় হচ্ছে, যে কোন আনুষ্ঠানিক কাজ প্রতিষ্ঠা করা বলতে দ্বিতীয় অর্থটি অবশ্যই হবে এবং প্রথম অর্থটি কখনই হবে না।

তাহলে নামাজ নামক আনুষ্ঠানিক আমলটি 'কায়েম করা' তথা 'প্রতিষ্ঠা করা' কথাটির যে দুটি অর্থ বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী হওয়া সম্ভব তা হচ্ছে–

১. নামাজের অনুষ্ঠানটির আরকান-আহকাম বিভিন্নভাবে (দাওয়াত, মসজিদ, মাদ্রাসা, বই ইত্যাদি) মানুষকে শিক্ষা দিয়ে, সুন্দর সুন্দর মসজিদ বানিয়ে সেখানে ঐ আরকান-আহকাম অনুযায়ী নামাজ পড়তে পারার ব্যবস্থা করা।

২. নামাজের অনুষ্ঠানগুলো আরকান-আহকাম মেনে নিষ্ঠার সঙ্গে করে তা থেকে মহান আল্লাহর দিতে চাওয়া শিক্ষাগুলো নিয়ে সে শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে কায়েম তথা প্রতিষ্ঠা করা।

এ দুটির মধ্যে বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী 'নামাজ কায়েম করা' কথাটির প্রকৃত অর্থ হবে ২য় টি। অর্থাৎ নামাজের অনুষ্ঠানগুলো আরকান-আহকাম মেনে নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে তা থেকে আল্লাহর দিতে চাওয়া শিক্ষাগুলো নিয়ে সে শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে কায়েম বা প্রতিষ্ঠা করা।

আল-কুরআন অনুযায়ী 'নামাজ কায়েম করা' কথাটির অর্থ

তথ্য-১

ক.

وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلاَّ لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُوْلَ مِمَّن يَّنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ.

www.pathagar.com

অর্থ: পূর্বে তোমরা যেদিকে মুখ করে দাঁড়াতে, সেটিকে আমি কেবলারূপে নির্দিষ্ট করেছিলাম শুধু এটি বুঝে নেয়ার জন্যে যে, কে রাসূলের অনুসরণ করে, আর কে বিপরীত দিকে ফিরে যায় (পিঠটান দেয়)। (বাকারা : ১৪৩)

ব্যাখ্যা: এই আয়াতটিতে আল্লাহ নামাজের ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি কথা বলেছেন। আয়াতটি ভালভাবে বুঝতে হলে এর নাযিলের পটভূমিটি আগে জানা দরকার। মদিনায় হিজরতের পর মুসলমানরা প্রথমে বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে নামাজ পড়ত। পরে আল্লাহর নির্দেশ আসে কাবা শরীফের দিকে অর্থাৎ পূর্ব দিকে মুখ করে নামাজ পড়ার জন্যে। আল্লাহর নির্দেশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানরা তা পালন করতে শুরু করে। এটি দেখে কাফেররা উপহাস করে বলতে লাগল, দেখ মুসলমানরা কী পাগলামি শুরু করেছে। কাল তারা নামাজ পড়েছে পশ্চিম দিকে মুখ করে আর আজ পড়ছে পূর্ব দিকে মুখ করে। কাফেরদের এই কথার জবাবে আল্লাহ এই আয়াতটি নাযিল করেন এবং এর মাধ্যমে তিনি ঐ কেবলা পরিবর্তন করার আদেশের উদ্দেশ্যটি বলে দেন। আল্লাহ বলছেন, নামাজ পড়ার সময় তোমাদের মুখ একদিক থেকে আর একদিকে ফেরানোর অর্থাৎ কেবলা পরিবর্তনের যে আদেশ আমি দিয়েছিলাম, তার পেছনে মুখ ফেরানোর অনুষ্ঠানটি করানো আমার উদ্দেশ্য ছিল না। বরং আমার উদ্দেশ্য ছিল এটি জেনে নেয়া যে, কে রাসূলের সা. তথা আমার আদেশ মেনে নেয়াকে তাদের অন্য সব কিছুর উপর অগ্রাধিকার দেয়।

এ কথা থেকে এটিই বুঝা যায় যে, নামাজের সময় কাবা শরীফের দিকে মুখ ফেরানো, রুকু, সিজদা ইত্যাদি অনুষ্ঠান পালনের আদেশের পেছনে আল্লাহর উদ্দেশ্য হচ্ছে, মুসলমানদের শিক্ষা দেয়া। আর সে শিক্ষার সবচেয়ে বড়টি হচ্ছে- তাঁর আদেশ পালনকে অন্য সব কিছুর উপর অগ্রাধিকার দেয়া। আর এটিই হচ্ছে, নামাজের অনুষ্ঠান পালন থেকে আল্লাহর দিতে চাওয়া শিক্ষার মধ্যে সব চেয়ে প্রধান শিক্ষা।

খ.

.....مَا يُرِيْدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَّلَكِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ.

অর্থ: ..... (নামাজের আগে ওজু গোসল করার শর্ত আরোপের দ্বারা) তোমাদের অহেতুক অসুবিধায় ফেলা (কষ্ট দেয়া) আল্লাহর ইচ্ছা নয়, বরং এর মাধ্যমে তিনি তোমাদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন (পবিত্র) করতে চান (বা করার শিক্ষা দিতে চান) এবং তোমাদের জন্যে তাঁর নেয়ামত (কল্যাণ কামনা) পরিপূর্ণ করে দিতে চান, যাতে তোমরা (কল্যাণপ্রাপ্ত ও খুশি হয়ে) তাঁর গুণগান করতে পার। (মায়েদাহ : ০৬)

www.pathagar.com

ব্যাখ্যাঃ সূরা মায়েদার এই আয়াতটির প্রথম দিকে (অনুল্লিখিত) নামাজের আগে ওজু, গোসল বা তায়াম্মুম করা এবং কখন ও কিভাবে তা করতে হবে, তার বিস্তারিত বিবরণ দেয়ার পর আয়াতটির শেষাংশে আল্লাহ এই বক্তব্যটি উল্লেখ করেছেন।

আল্লাহ এখানে বলেছেন, নামাজের আগে ওজু, গোসল (এবং কুরআনের অন্য স্থানের আদেশের মাধ্যমে কাপড় ও জায়গা পাক তথা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন) করার ঐ শর্ত আরোপ করার পেছনে তাঁর উদ্দেশ্য অবশ্যই মানুষকে কষ্ট দেয়া নয়। বরং এর পেছনে তাঁর উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে তার শরীর, পোশাক ও পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার একটি নীতিমালা শিক্ষা দেয়া। আর সে নীতিমালা হচ্ছে শরীরের উন্মুক্ত জায়গাগুলো প্রত্যেক দিন কয়েকবার পানি দিয়ে ধুয়ে-মুছে এবং পুরো শরীর, পোশাক-পরিচ্ছদ ও পরিবেশ, প্রতিদিন বা কয়েক দিন পর পর ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করা বা পরিষ্কার রাখা।

নামাজের আগে শরীর, কাপড় ও জায়গা তথা পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার আদেশের পেছনে উদ্দেশ্য যে ঐ সকল জিনিস পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করার সময়ের ব্যবধান কী হবে তার একটি সাধারণ নীতিমালা শিক্ষা দেয়া, তা বুঝা যায় আয়াতটির সর্বশেষে উল্লেখ করা আল্লাহর কথাটির মাধ্যমে। আল্লাহ সেখানে বলেছেন, শরীর, পোশাক-পরিচ্ছদ ও পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করার ঐ আদেশের মাধ্যমে, আমার পক্ষ থেকে তোমাদের কল্যাণ করার অভিপ্রায়কে পূর্ণ করে দিতে চাই। যাতে তোমরা ঐভাবে কল্যাণপ্রাপ্ত হয়ে আমি যে তোমাদের কল্যাণকামী তা বুঝতে পেরে খুশি হয়ে আমার শুকর বা গুণগান করতে পার।

আল্লাহর সেই কল্যাণ কামনা হচ্ছে মানুষকে রোগমুক্ত রাখা। মানুষের শরীর, পোশাক-পরিচ্ছদ ও পরিবেশ যদি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে তবে তাদের অনেক রোগ কম হয় বা অনেক রোগ হয় না। তাই আল্লাহ মানুষের শরীরের বিভিন্ন জায়গা, পোশাক-পরিচ্ছদ ও পরিবেশ কত ঘন ঘন পরিষ্কার করতে হবে, তার একটি সাধারণ নীতিমালার শিক্ষা এই আয়াতের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন। আর শরীর, কাপড় ও জায়গা পাকের উদ্দেশ্য যদি এটি না হত তবে বিবাহ না করা, স্ত্রী বা স্বামী না থাকা বা বার্ধক্য ও অন্য কারণে বৈধ যৌন মিলনের ক্ষমতা না থাকা ইত্যাদি অবস্থায় সপ্তাহ, মাস বা বছর গোসল না করে শুধু ওজু করে একজন লোক নামাজ পড়তে পারত। এ ক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তি ঘন ঘন গোসল করে পুরো শরীর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার মাধ্যমে অনেক রোগ থেকে মুক্ত থাকাস্বরূপ আল্লাহর চাওয়া বড় কল্যাণটি থেকে বঞ্চিত হত।

www.pathagar.com

তাই আয়াতটি থেকে সহজেই বলা ও বুঝা যায়, নামাজের জন্যে ওজু-গোসল করে বা ধুয়ে মুছে শরীর, পোশাক-পরিচ্ছদ ও জায়গা অর্থাৎ পরিবেশ, পাক তথা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করার নির্দেশের মাধ্যমে মহান আল্লাহ মানুষকে ঘন ঘন ধুয়ে-মুছে শরীর, পোশাক-পরিচ্ছদ ও পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার শিক্ষা দিতে চেয়েছেন।

❑❑ তথ্য দু'টি থেকে পরিষ্কার বুঝা যায়, নামাজের বিভিন্ন অনুষ্ঠান থেকে মহান আল্লাহ নামাজীকে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা দিতে চেয়েছেন।

তথ্য-২

সূরা বাকারার ১৭৭ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّيْنَ ج وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ لا وَالسَّائِلِيْنَ وَفِي الرِّقَابِ ط وَأَقَامَ الصَّلَوةَ وَآتَى الزَّكَوةَ ج وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ج وَالصَّابِرِيْنَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِيْنَ الْبَأْسِ ط أُولَئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوا ط وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ.

অর্থ: তোমরা মুখ পূর্ব দিক করলে না পশ্চিম দিক করলে, এটি কোন সওয়াব বা কল্যাণের কাজ নয়। বরং সওয়াব বা কল্যাণের কাজ সে-ই করে, যে আল্লাহ, পরকাল, ফেরেশতা, কিতাব ও নবীদের বিশ্বাস করে বা মান্য করে। আর শুধু আল্লাহর ভালবাসায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তাঁর ধনসম্পদকে আত্মীয়-স্বজন, মিসকিন, পথিক, সাহায্যপ্রার্থী ও ক্রীতদাস মুক্তির জন্যে ব্যয় করে এবং নামাজ কায়েম করে, জাকাত আদায় করে, ওয়াদা করলে তা পূরণ করে, দারিদ্র্য, বিপদ-আপদ ও হক বাতিলের দ্বন্দ্বের সময় হকের পক্ষে ধৈর্য ধারণ করে। এরাই (ঈমানের ব্যাপারে) সত্যবাদী এবং এরাই মুত্তাকী।

ব্যাখ্যা: এ আয়াতটিও মুসলমানদের কেবলা পরিবর্তন করে নামাজ পড়ার জন্যে কাফেরদের ঠাট্টা-বিদ্রূপের পরিপ্রেক্ষিতে নাযিল হয়।

আল্লাহ এখানে বলছেন, তোমাদের মুখ পশ্চিম দিকে না পূর্ব দিকে ঘুরালে, এতে কোন সওয়াব বা কল্যাণ নেই। অর্থাৎ নামাজের শুধু অনুষ্ঠানটি করার মধ্যে কোন সওয়াব বা কল্যাণ নেই। এরপর যে সব কাজের মধ্যে সওয়াব বা কল্যাণ রয়েছে, তার কয়েকটি বর্ণনা তিনি এখানে দিয়েছেন। বাকিগুলো সমস্ত কুরআন শরীফে ছড়িয়ে আছে। এই আয়াতে প্রকৃত সওয়াব বা কল্যাণের কাজ হিসেবে যেগুলো উল্লেখ করা হয়েছে তা হচ্ছে–

www.pathagar.com

১. আল্লাহ, পরকাল, কিতাব ও নবীদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা,
২. শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যে নিজ সম্পদ অভাবী আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতিম, মিসকিন, পথিক, সাহায্যপ্রার্থী ও ক্রীতদাস মুক্তির জন্যে ব্যয় করা,
৩. নামাজ কায়েম করা,
৪. জাকাত দেয়া,
৫. ওয়াদা করলে তা রক্ষা করা এবং
৬. বিপদ-আপদ ও হক-বাতিলের দ্বন্দ্বের সময়, হকের পক্ষে ধৈর্য ধারণ করা অর্থাৎ দৃঢ় পদে দাঁড়িয়ে থাকা।

লক্ষ্য করুন,আয়াতটির প্রথমে আল্লাহ বলছেন, নামাজের সময় মুখ পশ্চিম বা পূর্ব দিকে ফিরানোর মধ্যে কোন কল্যাণ বা সওয়াব নেই। অর্থাৎ নামাজের শুধু অনুষ্ঠান করার মধ্যে কোন কল্যাণ নেই। এরপর যে সমস্ত কাজের মধ্যে সওয়াব বা কল্যাণ আছে তার কয়েকটির বর্ণনা তিনি দিয়েছেন। এর মধ্যে একটি হচ্ছে 'নামাজ কায়েম করা'। সুতরাং এ আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, নামাজ কায়েম করার অর্থ নামাজের অনুষ্ঠানটি কায়েম বা প্রতিষ্ঠা করা নয়।

১ নং তথ্যের আয়াত দু'টির মাধ্যমে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন নামাজের অনুষ্ঠান করতে বলার পেছনে তাঁর উদ্দেশ্য হচ্ছে শিক্ষা দেয়া। তাহলে ২ নম্বর তথ্যের আয়াত দুটির সঙ্গে এক নম্বর তথ্যের আয়াত দু'খানি মিলালে সহজেই বুঝা যায় 'নামাজ কায়েম করা' বলতে মহান আল্লাহ বুঝিয়েছেন নামাজের অনুষ্ঠান কায়েম করা নয় বরং সে অনুষ্ঠান থেকে তাঁর দিতে চাওয়া শিক্ষা নিয়ে সে শিক্ষা বাস্তবে কায়েম করা।

আয়াতটির শেষাংশে আল্লাহ বলেছেন, যারা আয়াতে বর্ণিত আমলগুলি করে তারাই ঈমানের ব্যাপারে সত্যবাদী এবং মুত্তাকী। তাহলে আয়াতটিতে নামাজের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত তথ্য দুটির আলোকে নিঃসন্দেহে বলা যায়, মহান আল্লাহ এই আয়াতের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন, জানা সত্ত্বেও যারা ইচ্ছাকৃতভাবে নামাজের শুধু অনুষ্ঠানটি পালন করাকে নামাজ কায়েম করা মনে করে নামাজ আদায় করবে, তারা ঈমানের ব্যাপারে সত্যবাদী ও মুত্তাকী নয় অর্থাৎ পরকালে তাদের স্থান হবে জাহান্নাম। পক্ষান্তরে যারা নামাজের অনুষ্ঠানগুলো নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে তা থেকে আল্লাহর দিতে চাওয়া শিক্ষাগুলো নিয়ে সে শিক্ষা বাস্তবে কায়েম করবে, তারা ঈমানের ব্যাপারে সত্যবাদী এবং তারই মুত্তাকী, অর্থাৎ পরকালে তারা জান্নাতী হবে।

www.pathagar.com

তথ্য-৩

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا إِذَا نُوْدِي لِلصَّلَوةِ مِن يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ط ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُوْنَ.

অর্থঃ হে ব্যক্তিগণ, যারা ঈমান এনেছ, জুমআর দিন যখন নামাজের জন্যে (আজানের মাধ্যমে) ডাকা হয়, তখন বেচা-কেনা রেখে আল্লাহর স্মরণের দিকে (নামাজের দিকে) দ্রুত চলে যাও। এটি তোমাদের জন্যে উত্তম যদি জানতে।

(জুমআ : ৯)

ব্যাখ্যাঃ আয়াতেকারীমায় জুমআর নামাজের আজান হওয়ার সাথে সাথে সকলকে কেনা-বেচা অর্থাৎ কাজকর্ম ছেড়ে জামায়াতে নামাজ আদায়ের জন্যে দ্রুত মসজিদে চলে যেতে বলার পর মহান আল্লাহ বলেছেন, এটি যে ঈমানদারদের জন্যে অধিক কল্যাণকর তা বুঝতে পারত যদি বাস্তবে তারা তা দেখতে পেত।

সাধারণভাবে বুঝা যায়, সকল কাজ-কর্ম রেখে জামায়াতে নামাজ আদায় করতে চলে গেলে কিছু না কিছু ক্ষতি হয়। কিন্তু আল্লাহ বলেছেন, এটি অধিক কল্যাণকর। কেন আল্লাহ এরকম বললেন, তা আজ সকল মুসলমানের ভেবে দেখা দরকার।

পূর্বের তিনটি তথ্যের আলোকে সহজে বলা যায়, এখানে আল্লাহ বলেছেন, সকল কাজ-কর্ম রেখে জামায়াতে নামাজ আদায় করতে মসজিদে চলে গেলে কিছু ক্ষতি অবশ্যই হয়। কিন্তু জামায়াতে নামাজ আদায়ের মাধ্যমে তিনি সমাজ জীবনের যে শিক্ষা দিয়েছেন, সে শিক্ষাগুলো বুঝে বুঝে মনে-প্রাণে গ্রহণ করে প্রতিটি নামাজী যদি তা তাদের সমাজ জীবনে প্রয়োগ করে, তবে দুনিয়ায় তাদের যে সামগ্রিক কল্যাণ হবে তার পরিমাণ, জামায়াতে নামাজ আদায় করার সময়টুকুতে অন্য কাজ করলে যে কল্যাণ হবে তার চেয়ে অনেক অনেক বেশি। কথাটি যে কত বাস্তব জামায়াতে নামাজের শিক্ষাগুলো (পরে আসছে) পর্যালোচনা করলে যে কেউই সহজে তা বুঝতে পারবে।

আর পরকালে জামায়াতে নামাজ আদায় করার জন্যে যে অতিরিক্ত পুরস্কার বা কল্যাণ পাওয়া যাবে, তার সঙ্গে ঐ অল্প সময় কাজ-কর্ম করার দরুন যে লাভ হবে, তার তো কোন তুলনাই হবে না।

তথ্য-৪

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ. الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَوتِهِمْ سَاهُوْنَ. الَّذِيْنَ هُمْ يُرَاءُوْنَ. وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ.

www.pathagar.com

অর্থ: ধ্বংস (ওয়াইল নামক জাহান্নাম) সেই নামাজীদের জন্যে যারা নিজেদের নামাজের (সময়ের) ব্যাপারে বেখেয়াল। যারা লোক দেখানোর জন্যে কাজ করে এবং পাতিলের ঢাকনির মতো ছোটখাট জিনিসও মানুষকে দিতে চায় না।

(মা'উন : ৪-৬)

ব্যাখ্যা: আয়াতটি থেকে বুঝা যায়, যে নামাজীরা নামাজের সময়ের ব্যাপারে তথা যে কোন কাজের সময়ের ব্যাপারে বেখেয়াল থাকবে, লোক দেখানোর জন্যে কাজ করবে এবং অন্যদের ছোটখাট জিনিসও দিবে না বা দিতে নিষেধ করবে, তারা পরকালে জাহান্নামে যাবে। সময়ের ব্যাপারে বেখেয়াল থাকা অর্থাৎ সময় জ্ঞান না থাকা, লোক দেখানোর জন্যে কোন কাজ করা এবং ছোটখাট জিনিসও অপরকে না দেয়া বা দিতে নিষেধ করা নামাজের শিক্ষা বিরোধী।

সুতরাং এ আয়াত থেকে বুঝা যায়, নামাজের অনুষ্ঠান করে তা থেকে আল্লাহর দিতে চাওয়া শিক্ষা নিয়ে সে শিক্ষা বাস্তবে প্রয়োগ না করলে ঐ নামাজ কবুল হবে না। আর তাই ঐ নামাজীকে পরকালে জাহান্নামে যেতে হবে। আর এ তথ্যটি দুই নাম্বার তথ্যের আয়াতটির শেষাংশের ব্যাখ্যার সঙ্গে পুরোপুরি সামঞ্জস্যশীল।

সুধী পাঠক, তাহলে কুরআনের উল্লিখিত এ তিনটি তথ্য থেকে স্পষ্টভাবে বুঝা যায়, কুরআন অনুযায়ী নামাজ সফল বা কবুল হতে হলে নামাজকে কায়েম করতে হবে। আর কুরআন অনুযায়ী এই নামাজ কায়েম করার অর্থ হচ্ছে– আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যে (মানুষ দেখানোর জন্যে নয়) নামাজের সকল অনুষ্ঠান আরকান-আহকাম মেনে নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে তা থেকে আল্লাহর দিতে চাওয়া শিক্ষা নিয়ে সে শিক্ষা নামাজের উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে বাস্তবায়ন করা। আর তা না করলে নামাজ ব্যর্থ হবে তথা কবুল হবে না এবং ঐ নামাজীকে পরকালে জাহান্নামে যেতে হবে।

হাদীস অনুযায়ী 'নামাজ কায়েম করা' কথাটির অর্থ

তথ্য-১

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فُلاَنَةَ يُذْكَرُ مِنْ كَثْرَةِ صَلَوتِهَا وَصِيَامِهَا وَصَدَقَتِهَا غَيْرَ أَنَّهَا تُؤْذِي جِيْرَانَهَا بِلِسَانِهَا قَالَ هِيَ فِي النَّارِ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ فَإِنَّ فُلاَنَةً يُذْكَرُ مِنْ قِلَّةِ صِيَامِهَا وَصَدَقَتِهَا وَصَلَوتِهَا وَإِنَّهَا تَصَدَّقُ بِالْأَثْوَارِ مِنَ الْأَقِطِ وَلاَ تُؤْذِي جِيْرَانَهَا بِلِسَانِهَا قَالَ هِيَ فِي الْجَنَّةِ.

www.pathagar.com

অর্থ: আবু হুরায়রা রা. বলেন, একদা জনৈক ব্যক্তি বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ, অমুক মহিলা নামাজ ও যাকাতে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। তবে সে নিজের মুখ দ্বারা তার প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়। তিনি বললেন, সে জাহান্নামী। লোকটি আবার বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ, অমুক মহিলা সম্পর্কে জনশ্রুতি আছে যে, সে কম (নফল) রোজা রাখে, কম (নফল) সদকা করে এবং নামাজও (নফল) কম পড়ে। তার দানের পরিমাণ হলো পনিরের টুকরাবিশেষ। কিন্তু সে নিজের মুখ দ্বারা প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয় না। রাসূল সা. বললেন, সে জান্নাতী।

(আহমাদ ও বায়হাকী, শো'আবুল ঈমান)

ব্যাখ্যা: প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়া নামাজের পঠিত বিষয়ের একটি শিক্ষা। হাদীসটিতে দেখা যায়, প্রথম মহিলাটি প্রচুর নামাজ পড়ার পরও মুখের দ্বারা প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়ার কারণে জাহান্নামী হয়ে গিয়েছে। এর কারণ, প্রচুর নামাজ আদায় করেও তা থেকে সে শিক্ষা নেয়নি এবং সে শিক্ষা বাস্তবে কায়েম বা প্রতিষ্ঠা করেনি।

অন্যদিকে হাদীসে উল্লেখিত দ্বিতীয় মহিলাটি অল্প নামাজ আদায় করেও প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়ার কারণে জান্নাতী হয়েছে। এর কারণ, মহিলাটি ঐ অল্প নামাজ থেকে শিক্ষা নিয়ে সে শিক্ষা বাস্তবে কায়েম করেছে।

তাহলে এ হাদীসটি থেকে সহজেই বলা যায়, নামাজের অনুষ্ঠানগুলো নিষ্ঠার সঙ্গে আরকান-আহকাম মেনে পালন করে তা থেকে আল্লাহর দিতে চাওয়া শিক্ষাগুলো নিয়ে সে শিক্ষা বাস্তবে প্রয়োগ করলেই শুধু নামাজ সফল, কবুল বা কায়েম হবে এবং ফলস্বরূপ ঐ নামাজী পরকালে বেহেশতে যেতে পারবে। আর তা না হলে নামাজ কবুল হবে না বা ব্যর্থ হবে এবং পরকালে ঐ নামাজীকে জাহান্নামে যেতে হবে।

তথ্য-২

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَتَدْرُوْنَ مَا الْمُفْلِسُ قَالُوا الْمُفْلِسُ فِيْنَا مَنْ لاَ دِرْهَمَ لَهُ وَلاَ مَتَاعَ فَقَالَ إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَوةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَوةٍ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ.

www.pathagar.com

অর্থঃ আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূল সা. বললেন, তোমরা কি জান, সবচেয়ে দরিদ্র ব্যক্তি কে? সাহাবায়ে কিরাম জবাব দিলেন, আমাদের মধ্যে দরিদ্র হল সে, যার টাকা-পয়সা ও ধন-সম্পদ নেই। তিনি বললেন, আমার উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে দরিদ্র ব্যক্তি সে, যে কিয়ামতের ময়দানে নামাজ, রোজা ও যাকাত নিয়ে উপস্থিত হবে কিন্তু তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আসতে থাকবে যে সে কোন মানুষকে গালি দিয়েছে, কাউকে মিথ্যা দোষারোপ করেছে, কারোর সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করেছে, কারো রক্ত অন্যায়ভাবে প্রবাহিত করেছে বা কাউকে অন্যায়ভাবে আঘাত করেছে। অতঃপর তার নামাজ, রোজা, যাকাত ইত্যাদি আমলগুলোকে বিনিময় হিসাবে ঐ ক্ষতিগ্রস্ত বা কষ্টপ্রাপ্ত লোকগুলোকে দেয়া হতে থাকবে। এভাবে তার সকল আমল বিনিময় দিয়ে শেষ হয়ে যাবার পর দাবিদারদের পাপগুলো তার উপর চাপানো হবে। অবশেষে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। (মুসলিম)

ব্যাখ্যাঃ হাদীসটিতে দেখা যায়, নামাজ আদায় করার সাথে সাথে কেউ যদি মানুষকে গালি দেয়, কাউকে মিথ্যা দোষারোপ করে, কারো সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করে, কারো রক্ত অন্যায়ভাবে প্রবাহিত করে, কাউকে অন্যায়ভাবে আঘাত করে তবে তার ঐ নামাজ পরকালে কাজে আসবে না অর্থাৎ কবুল হবে না এবং তাকে জাহান্নামে যেতে হবে। কারণ ঐ কাজগুলো না করা নামাজের পঠিত বিষয়ের শিক্ষার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।

তাই, এ হাদীসটি থেকেও বলা যায় নামাজের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আল্লাহর দিতে চাওয়া শিক্ষাগুলো নিয়ে সে শিক্ষা বাস্তবে প্রয়োগ না করলে নামাজ সফল, কবুল বা কায়েম হবে না। অর্থাৎ নামাজ ব্যর্থ হবে এবং ফলস্বরূপ নামাজীকে পরকালে জাহান্নামে যেতে হবে।

তথ্য-৩

وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْحَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ اِلَى جِبْرَائِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، اَنِ اقْلِبْ مَدِيْنَةَ كَذَا وَكَذَا بِاَهْلِهَا فَقَالَ يَارَبِّ اِنَّ فِيْهِمْ عَبْدُكَ فُلَانًا لَّمْ يَعْصِكَ طَرْفَةَ عَيْنٍ قَالَ فَقَالَ اَقْلِبْهَا عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ فَاِنَّ وَجْهَهُ لَمْ يَتَمَعَّرْ فِيْ سَاعَةٍ قَطُّ.

অর্থঃ জাবের রা. বলেন, রাসূল সা. বলেছেন, মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ জিব্রাইল আ.কে নির্দেশ দিলেন, অমুক অমুক শহরকে তার অধিবাসী সমেত উল্টিয়ে দাও। তিনি বললেন, হে রব, তাদের মধ্যে তো তোমার অমুক এক বান্দা আছে যে মুহূর্তের জন্যেও তোমার নাফরমানী করে নাই। রাসূল সা. বলেন, তখন আল্লাহ তায়ালা বললেন, তার ও তাদের সকলের উপরই শহরটিকে উল্টিয়ে দাও। কারণ, সম্মুখে পাপাচার হতে দেখে মুহূর্তের জন্যেও তার চেহারা মলিন হয় নাই। (বায়হাকী, শো'আবুল ঈমান)

www.pathagar.com

ব্যাখ্যা: হাদীসটি থেকে বুঝা যায়, লোকটি নামাজসহ সকল উপাসনামূলক ইবাদতই নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করছিল কিন্তু তার সম্মুখে সংঘটিত হওয়া পাপাচার অর্থাৎ অন্যায় কাজ বন্ধ করার ব্যাপারে সে কোন রকম ভূমিকা রাখে নাই। আর তাই তাকে শাস্তি পেতে হয়েছে।

শক্তি প্রয়োগ বা কথার মাধ্যমে পাপাচার বন্ধ করা, না পারলে অন্তত ঐ পাপ কাজ বা পাপ কাজ সংঘটনকারীকে অন্তরে ঘৃণা করা নামাজের পঠিত বিষয়ের (আল-কুরআনের) একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা। হাদীসটিতে উল্লিখিত ব্যক্তির নামাজ পড়ার পর সামনে পাপাচার হতে দেখে ভ্রূকুটিও না করা থেকে বুঝা যায়, সে নামাজের অনুষ্ঠানটি করেছে কিন্তু ঐ অনুষ্ঠান থেকে শিক্ষা নেয়নি। তাই সামনে পাপাচার হতে দেখেও তার ভ্রূকুটি হয়নি এবং ফলস্বরূপ তাকে শাস্তি পেতে হয়েছে।

সুতরাং এ হাদীসটি থেকেও জানা যায়, নামাজ সফল, কবুল বা কায়েম হতে হলে নামাজকে শুধু তার অনুষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে পালন করলে চলবে না। বরং নামাজের অনুষ্ঠানগুলো নিষ্ঠার সঙ্গে করে তা থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষাগুলো নিয়ে সে শিক্ষা নামাজের উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে বাস্তবে প্রয়োগ, কায়েম বা প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

সুধী পাঠক

তাহলে দেখা যাচ্ছে, নামাজ বর্তমানে ব্যর্থ হওয়ার কারণের ব্যাপারে কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধির বক্তব্য একই। আর সে কারণগুলো হচ্ছে অধিকাংশ নামাজীর–

১. নামাজের কুরআনে বর্ণিত উদ্দেশ্যটি না জানা।
২. নামাজের অনুষ্ঠানটিকে পাথেয় তথা উদ্দেশ্য সাধনের মাধ্যম মনে না করে উদ্দেশ্য মনে করা।
৩. নামাজের অনুষ্ঠানটি আরকান-আহকাম মেনে সঠিকভাবে নিষ্ঠার সঙ্গে (লোক দেখানোর জন্যে নয়) পালন না করা।
৪. নামাজের প্রতিটি অনুষ্ঠান থেকে আল্লাহ যে শিক্ষা দিতে চেয়েছেন, তা বুঝে বুঝে মনে-প্রাণে গ্রহণ না করা।
৫. সে শিক্ষা নামাজের উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে কায়েম, প্রতিষ্ঠা বা বাস্তবায়ন না করা।

নামাজের শিক্ষার শ্রেণী বিভাগ

চলুন এখন নামাজের শিক্ষাগুলো পর্যালোচনা করা যাক। মহান আল্লাহ দু'ভাবে নামাজ থেকে শিক্ষা দিয়েছেন বা দিতে চেয়েছেন। যথা–

ক. অনুষ্ঠান থেকে শিক্ষা এবং
খ. পঠিত বিষয় থেকে শিক্ষা।

www.pathagar.com

অনুষ্ঠান থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষা আবার দু'ভাগে বিভক্ত। যথা–

১. ব্যক্তি জীবনের শিক্ষা এবং

২. সমাজ জীবনের শিক্ষা।

নামাজের পঠিত বিষয় থেকে শিক্ষাগুলোকে নিম্নোক্তভাবে ভাগ করা যায়–

১. সূরা ফাতেহা পড়া থেকে শিক্ষা,

২. অন্য সূরা পড়া থেকে শিক্ষা,

৩. তাসবীহ পড়া থেকে শিক্ষা এবং

৪. দোয়া থেকে শিক্ষা।

চলুন এখন নামাজ থেকে আল্লাহর দিতে চাওয়া শিক্ষাগুলো একটু বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনা করা যাক–

নামাজের অনুষ্ঠান থেকে শিক্ষা

ব্যক্তিজীবনের জন্যে নামাজের অনুষ্ঠান থেকে শিক্ষা

একজন ব্যক্তি তার জীবনকে ইসলাম অনুযায়ী যাতে সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে পারে, সে জন্যে নামাজ তার অনুষ্ঠান থেকে যে শিক্ষাগুলো দেয়, তা হচ্ছে–

১. আল্লাহর আদেশ মানার মানসিকতা সৃষ্টি করা

নামাজের মাধ্যমে দিতে চাওয়া শিক্ষাগুলোর মধ্যে এটিই হচ্ছে সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। একজন মুসলমান তার সকল কাজকর্ম ফেলে নামাজ পড়তে চলে যায় বা দাঁড়িয়ে যায়, কারণ এটি আল্লাহর নির্দেশ। এটি না করলে কেউ তাকে মারধর করে না। অর্থাৎ শুধু আল্লাহর ভয়ে সে এটি করছে। প্রতিদিন পাঁচ বার মুসলমানদের অন্তরে এই আল্লাহভীতি জাগিয়ে দিয়ে নামাজ মুসলমানদের অন্তরে আল্লাহভীতি এমনভাবে বদ্ধমূল করে দিতে চায় যে, তারা যেন তাদের জীবনের প্রতিটি কাজ করার সময় এই আল্লাহভীতিকে সামনে রাখে। অর্থাৎ আল্লাহর খুশি হওয়াকে সামনে রাখে। আল্লাহ অখুশি হন এমন কোন কাজ সে করবে না এবং খুশি হন এমন সব কাজই করবে। আর ঐ কাজগুলো যেভাবে করলে আল্লাহ খুশি হন, শুধু সেভাবেই সে তা করবে। প্রতিটি কাজ ঐভাবে সে এ জন্যেই করবে যে ঐভাবে কাজটি করলে সে দুনিয়া ও আখিরাতে লাভবান হবে এবং কাজটি না করলে বা ঐভাবে না করলে সে কোন মতেই আল্লাহর শাস্তি তথা দুঃখ-কষ্ট থেকে দুনিয়া ও আখিরাতে রেহাই পাবে না। নামাজের অনুষ্ঠান থেকে শিক্ষার ব্যাপারে এ কথাটিই আল্লাহ বলেছেন, সূরা বাকারার ১৪৩ নং আয়াতে, যা আগে আলোচনা করা হয়েছে।

www.pathagar.com

২. আল্লাহর আদেশ-নিষেধ নির্ভুল উৎস তথা আল-কুরআন থেকে জানার মানসিকতা তৈরি করা

নামাজে মহান আল্লাহ শুধু আল-কুরআন পড়তে বলেছেন। হাদীস, ফিকাহ্ গ্রন্থ, ইসলামী সাহিত্য, ডাক্তারী বই, অর্থনীতির বই বা অন্য কোন গ্রন্থ পড়তে বলেননি। এর মাধ্যমে আল্লাহ শিক্ষা দিয়েছেন ইসলামকে প্রথমে জানতে হবে নির্ভুল উৎস আল-কুরআন থেকে। কারণ কুরআনের সূরা নাহলের ৮৯ নং আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি ইসলামের সকল মূল তথা সকল প্রথম স্তরের মৌলিক বিষয় কুরআনে উল্লেখ করে রেখেছেন। আর ঐ বিষয়গুলো হচ্ছে কুরআনের মূল বিষয়। ঐ চিরসত্য মূল বিষয়গুলো না জেনে কেউ যদি শুধু হাদীস, ফিকাহ বা ইসলামী সাহিত্য পড়ে ইসলাম জানতে চায়, তবে সে কখনই সঠিক ইসলাম জানতে পারবে না। আর এর ফলে সে ইসলামের ব্যাপারে নানা রকম ধোঁকায় পড়ে যাবে।

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, ইসলামের নামে কিছু অসতর্ক প্রচারণা, যা কুরআন, সুন্নাহ ও বিবেক বিরুদ্ধ, মুসলমানদের আজ নামাজের এই গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা থেকে অনেক দূরে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছে। তাইতো দেখা যায়, অধিকাংশ নিষ্ঠাবান নামাজীরও আজ কুরআনের জ্ঞান নেই। আর এই অজ্ঞতার দরুন তারা ইসলামের অনেক প্রথম স্তরের মৌলিক বিষয়ের ব্যাপারেও নানাভাবে শয়তানের ধোঁকায় পড়ছে। এই অসতর্ক প্রচারণায় কয়েকটি হচ্ছে-

ক. কুরআনের জ্ঞান অর্জন করা ফরজ হলেও গুরুত্বের দিক দিয়ে তার স্থান অন্য অনেক আমলের নিচে।

খ. কুরআনের জ্ঞান অর্জন করা সকলের জন্যে ফরজ নয়।

গ. ওজু ছাড়া কুরআন পড়া যাবে কিন্তু স্পর্শ করা মহাপাপ।

ঘ. অর্থ ছাড়া বা জ্ঞান অর্জনের লক্ষ্য ছাড়া কুরআন পড়লেও প্রতি অক্ষরে দশ নেকী।

ঙ. কুরআন বুঝা কঠিন। তাই বুঝতে গেলে গুমরাহ হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

চ. জ্ঞান অর্জনের চেয়ে আমলের গুরুত্ব বেশি।

ছ. জানার পর পালন না করলে না জানার দরুন পালন না করার চেয়ে বেশি গুনাহ। তাই বেশি জানলে বেশি বিপদ।

বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করেছি, 'কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী- 'মুমিনের এক নাম্বার কাজ আর শয়তানের এক নাম্বার কাজ', 'ওজু ছাড়া কুরআন স্পর্শ করলে গুনাহ হবে কি?', 'ইচ্ছাকৃতভাবে অর্থ ছাড়া কুরআন পড়া গুনাহ না সওয়াব' নামের পুস্তিকাগুলোতে।

www.pathagar.com

৩. পর্দা করার শিক্ষা

পর্দা করা ইসলামী জীবন বিধানের একটি গুরুত্বপূর্ণ ফরজ কাজ। নামাজে সতর ঢেকে রাখার বিধানের মাধ্যমে আল্লাহ্ প্রতিদিন পাঁচ বার এই ফরজ কাজটির কথা মুসলমান নর-নারীদের স্মরণ করিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করেছেন। আজ মুসলমান মহিলাদের অত্যন্ত নগণ্য সংখ্যকই ব্যক্তিগত জীবনে নামাজের এই গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাটিকে মেনে চলেন। নামাজের এই গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাটির কী দারুণ অবহেলা তারা করছেন, তাই না?

৪. সময় জ্ঞান শিক্ষা দেয়া

পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আদায় করতে হয়। এই সময় বেঁধে দিয়ে আল্লাহ মুসলমানদের সময়জ্ঞানের শিক্ষা দিতে চেয়েছেন। পুরো মুসলিমবিশ্বে বর্তমানে এই সময়জ্ঞানের দারুণ অভাব। নামাজের এই গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষার কী দারুণ উপেক্ষা, তাই না? অথচ মানুষের জীবন পরিচালনার জন্যে এটি একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বর্তমান বিশ্বে উন্নত জাতিগুলোর মধ্যে এই সময়জ্ঞান বেশ প্রখর।

৫. শরীর সুস্থ ও সবল রাখার শিক্ষা

নামাজের মাধ্যমে মহান আল্লাহ মানুষের শরীর সুস্থ ও সবল রাখার অপূর্ব শিক্ষা দিয়েছেন নিম্নোক্তভাবে–

ক. শরীর, পোশাক-পরিচ্ছাদ ও জায়গা তথা পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার মাধ্যমে শরীর সুস্থ রাখার শিক্ষা

পূর্বেই (পৃষ্ঠা নং ২২) উল্লেখ করা হয়েছে নামাজের আগে শরীর, কাপড় ও জায়গা পাক তথা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার শর্তের মাধ্যমে মহান আল্লাহ মানুষকে তাদের শরীর, পোশাক-পরিচ্ছদ ও পরিবেশকে ঘন ঘন ধোয়া-মোছার মাধ্যমে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার শিক্ষা দিয়েছেন। আর এভাবে তিনি তাদের নানা ধরনের রোগের হাত থেকে মুক্ত থাকার এক অপূর্ব ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় শরীর, পোশাক ও পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যাপারে দিনে পাঁচবার শিক্ষা দেয়ার পরও মুসলমানরা আজ পৃথিবীর অনেক জাতির চেয়ে ঐ ব্যাপারে অনেক অনেক পেছনে পড়ে আছে।

খ. ব্যায়াম করা ও ব্যায়ামে কী কী অঙ্গভঙ্গি (Movement) করতে হবে তা শিক্ষা দেয়ার মাধ্যমে রোগমুক্ত রাখার ব্যবস্থা

সিজদা হচ্ছে নামাজের মধ্যে আল্লাহর সবচেয়ে পছন্দের অবস্থান। তাই আল্লাহ তো নামাজের সময় শুধু সিজদায় থেকে দোয়া কালাম পড়ে নামাজ শেষ করতে বলতে পারতেন। কিন্তু তা না করে তিনি হাত উঠিয়ে তাকবীরে তাহরীমা, মেরুদণ্ড বাঁকিয়ে রুকু ও সিজদা এবং ঘাড় ফিরিয়ে সালাম ফেরানোর মাধ্যমে নামাজ আদায় করতে বলেছেন। এখান থেকে বুঝা যায়, নামাজের বিভিন্ন

www.pathagar.com

অঙ্গভঙ্গির একটা শিক্ষা হচ্ছে শরীর চর্চার শিক্ষা। আর শরীর চর্চার সময় কী কী অঙ্গভঙ্গির দিকে বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে, নামাজের মাধ্যমে আল্লাহ তা শিক্ষা দিয়েছেন। ডাক্তারী বিদ্যায় এখন এটি একটি প্রতিষ্ঠিত বিষয় যে, নিয়মিত ব্যায়াম করলে মানুষের বিভিন্ন রোগ-ব্যাধি অনেক কম হয়। নামাজ থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষাগুলো নিয়ে বাস্তবে তা নামাজীরা পালন করুক, এটিই তো আল্লাহ চান। মুসলমানরা যদি ব্যায়ামের সময় কী ধরনের অঙ্গভঙ্গি করতে হবে নামাজ থেকে ঐ শিক্ষাগুলো নিয়ে বাস্তবে প্রতিদিন ঐভাবে কিছুক্ষণ ব্যায়াম করে তবে তাদের অনেক রোগ-ব্যাধি কম হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় অধিকাংশ নামাজীই শরীর সুস্থ রাখার ব্যাপারে নামাজের এই অপূর্ব শিক্ষাটি বাস্তবে পালন করেন না।

গ. মেসওয়াক করার মাধ্যমে শরীর সুস্থ রাখার শিক্ষা

ওজুর সময় মেসওয়াক করা সুন্নত। রাসূল সা. এটিকে এত গুরুত্ব দিতেন যে, ওফাতের আগে যখন অজ্ঞান অবস্থা থেকে একটু জ্ঞান আসছিল তখনই তিনি মেসওয়াক চাচ্ছিলেন। পাঁচবার ওজুর সময় কেউ যদি নিয়মিত মেসওয়াক বা ব্রাশ করে তবে তার দাঁত ও মুখের রোগ অনেক অনেক কম হবে। তাছাড়া রাসূল সা. বলেছেন, মেসওয়াক করে নামাজ পড়লে নামাজের সওয়াব অনেক গুণ বেড়ে যায়।

❑❑ এখন প্রশ্ন থাকে যে, কী কারণে আল্লাহ মুসলমানদের নামাজের মাধ্যমে এভাবে শরীর সুস্থ-সবল রাখার শিক্ষা দিলেন। সে কারণটি হচ্ছে, ইসলামকে বিজয়ী শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করতে গেলে মুসলমানদের জরা-জীর্ণ শরীরের অধিকারী হলে চলবে না। ঐ কাজ করতে তাদের কঠোর প্রতিরোধের মুকাবেলা করতে হবে। সুতরাং তাদের অবশ্যই সুস্থ-সবল স্বাস্থ্যের অধিকারী হতে হবে। তাই নামাজের মাধ্যমে আল্লাহ মুসলমানদের শরীর-স্বাস্থ্য, সুস্থ-সবল রাখার এই অপূর্ব শিক্ষা দিয়েছেন।

৬. ইসলামের বিধানসমূহ গুরুত্ব অনুযায়ী পালনের শিক্ষা

নামাজের বিধানসমূহকে ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাত ও মুস্তাহাব এই চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে। নিয়ম হচ্ছে, ফরজে ভুল হলে নামাজ হবে না। ওয়াজিবে ভুল হলে সহূ সেজদা দ্বারা তা না শোধরালে নামাজ হবে না। সুন্নাতে ভুল হলে নামাজ হবে তবে একটু দুর্বল হবে। আর মুস্তাহাবে ভুল হলে নামাজের কোন ক্ষতি হবে না।

নামাজের বিধানগুলো গুরুত্ব অনুযায়ী পালনের বিধান থেকে শিক্ষা হচ্ছে, ইসলামী জীবন বিধানেও মৌলিক ও অমৌলিক বিষয় আছে। মৌলিক বিষয়গুলোর কোন একটি বাদ দিয়ে অমৌলিক বিষয়গুলো যতই পালন করা হোক না কেন, তাতে ইসলাম পালন হবে না এবং ঐ ব্যক্তিকে জাহান্নামে যেতে

www.pathagar.com

হবে। আর মৌলিক বিষয়গুলো পালন করার পর অমৌলিক বিষয় পালনে যদি কিছু দুর্বলতা থাকে, তবে তাতে কিছু দুর্বল হলেও ইসলাম পালন হয়ে যাবে। অর্থাৎ ঐ ব্যক্তিকে জাহান্নামে যেতে হবে না। তবে তার বেহেশতের মান (Grade) কিছু কমবে।

সমাজ জীবনের জন্যে নামাজের অনুষ্ঠান থেকে শিক্ষা

মানুষ সামাজিক জীব। সুশৃঙ্খল ও সমাজবদ্ধ মানবজীবন আধুনিক সভ্যতার পূর্বশর্ত। তাই মানুষ গড়ার প্রোগ্রামে যদি সুষ্ঠু সমাজবদ্ধ জীবন গড়ার শিক্ষা না থাকে, তবে সেই প্রোগ্রাম অসম্পূর্ণ থেকে যায়। আল্লাহর মানুষ গড়ার প্রোগ্রাম অসম্পূর্ণ থাকতে পারে না। তাই মুসলমানরা কিভাবে তাদের সমাজ জীবন পরিচালনা করবে, তার অপূর্ব শিক্ষা তিনি নামাজের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দিয়েছেন। এ শিক্ষা আল্লাহ 'জামায়াতে' নামাজ পড়ার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দিয়েছেন।

জামায়াতে নামাজের গুরুত্বের ব্যাপারে কুরআনের বক্তব্য

জামায়াতে নামাজ পড়াকে কুরআনে খুব গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। তাই ইসলামী শরীয়াতে এটি একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ কাজ। পবিত্র কুরআনের দুই স্থানে জামায়াতে নামাজ আদায় করার কথাটি বা আদায় করার গুরুত্ব নিম্নোক্তভাবে উল্লেখ করা হয়েছে–

❑ সূরা বাকারার ৪৩ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন–

وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِيْنَ.

অর্থ: রুকুকারীগণের সাথে রুকু কর।(অর্থাৎ জামায়াতের সঙ্গে নামাজ আদায় কর)।

❑❑ জুম্আর নামাজ জামায়াতে আদায় করার ব্যাপারে সূরা-জুমআর ৯ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন–

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ.

অর্থ: হে ব্যক্তিগণ যারা ঈমান এনেছ, জুমআর দিনে যখন নামাজের জন্যে ডাকা হয় তখন কেনা-বেচা ত্যাগ করে আল্লাহর স্মরণের (নামাজের) দিকে দ্রুত চলে যাও। এটি তোমাদের জন্যে অধিক উত্তম, যদি তোমরা জানতে।

ব্যাখ্যা: আয়াতে কারীমার ব্যাখ্যা ২৬ নং পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে।

www.pathagar.com

জামায়াতে নামাজের ব্যাপারে হাদীস

জামায়াতে নামাজ পড়ার গুরুত্ব বর্ণনাকারী অনেক হাদীস আছে। এখানে আমি শুধু বোখারী ও মুসলিম শরীফের একটি হাদীসের প্রকৃত বক্তব্যটা উপস্থাপন করছি। আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূল সা. বলেছেন, আল্লাহর কসম, আমার ঐ সব মুসলমানের ঘরে আগুন ধরিয়ে দিতে ইচ্ছে করে যারা (বিশেষ ওজর ছাড়া) আযানের পর জামায়াতে নামাজ পড়তে না এসে, ঘরে একা নামাজ পড়ে।

উপরে বর্ণিত কুরআন ও হাদীসের বক্তব্য থেকে অতি সহজে বুঝা যায় যে, ইসলাম জামায়াতে নামাজ পড়াকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছে। আল্লাহ বলেছেন, তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি কাজ বন্ধ রেখে জামায়াতে নামাজ পড়তে আসা অনেক উত্তম। এ কথাটি যে কত বড় সত্য তা অতি সহজে বুঝা যাবে, জামায়াতে নামাজের মাধ্যমে আল্লাহ যে শিক্ষাগুলো দিতে চেয়েছেন, সেগুলো জানার পর। তখন আমরা সবাই এক বাক্যে স্বীকার করতে বাধ্য হব, যে সমাজে ঐ শিক্ষাগুলোর বাস্তব প্রয়োগ নেই, সেখানে মানুষের যতই টাকা-পয়সা, ব্যবসা-বাণিজ্য থাকুক না কেন, সামাজিক শান্তি বলতে কিছুই থাকতে পারে না।

এবার চলুন জামায়াতে নামাজের সামাজিক শিক্ষাগুলো আলোচনা করা যাক। সে অপূর্ব শিক্ষাগুলো হচ্ছে–

১. সমাজের সদস্যদের পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব, বন্ধুত্ব, ভালবাসা, সহানুভূতি, সহমর্মিতা, স্নেহ-শ্রদ্ধা ইত্যাদি সামাজিক গুণ সৃষ্টি করা

পবিত্র কুরআনের সূরা হুজুরাতের ১০ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন,

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ إِخْوَةٌ.

অর্থ ও ব্যাখ্যা: মুমিনরা পরস্পরের ভাই। আল্লাহ এখানে বলছেন, এক ভাইয়ের অন্তরে অন্য ভাইয়ের জন্যে যেমন সহানুভূতি, সহমর্মিতা, স্নেহ-শ্রদ্ধা, ভালবাসা ইত্যাদি থাকে, একজন মুমিনের অন্তরেও ঠিক অন্য মুমিনের জন্যে অনুরূপ অনুভূতি থাকবে।

রাসূল সা. বলেছেন, মুসলমানদের সমাজ একটি দেহের মত। দেহের কোথাও কোন ব্যথা বা কষ্ট হলে সমস্ত দেহে তা অনুভূত হয়। আবার দেহের কোথাও সুখ অনুভূত হলে তাও সমস্ত শরীরে অনুভূত হয়। মুসলমানদের সমাজও হতে হবে অনুরূপ। অর্থাৎ তাদের সমাজেরও কোন ব্যক্তির উপর কোন দুঃখ-কষ্ট আসলে সমাজের সকলের উপর তার ছাপ পড়তে হবে এবং সবাইকে সেটি দূর করারও চেষ্টা করতে হবে। আবার সমাজের কারো কোন সুখের কারণ ঘটলেও সমাজের সকলের উপর তার ছাপ পড়তে হবে।

www.pathagar.com

'মুমিনরা পরস্পরের ভাই'—কথাটি বলেই আল্লাহ ছেড়ে দেন নাই। ভাইয়ের অন্তরে ভাইয়ের জন্যে যেমন স্নেহ-শ্রদ্ধা, মমতা, ভালবাসা, সহমর্মিতা ইত্যাদি থাকে তেমন মুসলমানদের সমাজের সদস্যদের পরস্পরের অন্তরেও অনুরূপ গুণাবলী সৃষ্টি করার জন্যে, তিনি ব্যবস্থা দিয়েছেন জামায়াতে নামাজের। আর এটি জামায়াতে নামাজ পড়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা।

এ কথা সবাই স্বীকার করবেন যে, পারস্পরিক দেখা-সাক্ষাৎ, ওঠা-বসা যত বেশি হয়, ততই একজনের প্রতি আর একজনের মায়া-মহব্বত, স্নেহ-মমতা, সহানুভূতি, সহমর্মিতা ইত্যাদি বেশি হয়। আর তা না হলে ঐ সবগুলো বিষয়ই ধীরে ধীরে কমে যায় (Out of sight out of mind)। জামায়াতে নামাজ মুসলমানদের সমাজের একজনের সঙ্গে আর একজনের সেই দেখা-সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দিয়েছে। জামায়াতে নামাজ প্রতিদিন পাঁচবার নিজ এলাকার লোকদের সঙ্গে, প্রতি সপ্তাহে একবার (জুমআর নামাজ) আরো একটু বড় এলাকার লোকদের সঙ্গে এবং প্রতি বছর দু'বার (ঈদের নামাজ) আরো একটু বড় এলাকার লোকদের সঙ্গে এবং প্রতি বছর একবার (হজ্জের সময়) সমস্ত পৃথিবীর সচ্ছল মুসলমানদের পরস্পরের মধ্যে দেখা-সাক্ষাতের ব্যবস্থা করেছে। কী অপূর্ব ব্যবস্থা! অন্য কোন জীবন ব্যবস্থায় সমাজের সদস্যদের পরস্পরের প্রতি স্নেহ-মমতা, ভালবাসা তৈরি করার এমন অপূর্ব সুন্দর ব্যবস্থা আছে কি?

২. সামাজিক সাম্য তৈরির শিক্ষা

পবিত্র কুরআনের সূরা হুজরাতের ১৩ নং আয়াতে আল্লাহ বলছেন :

يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ط إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ ط

অর্থ: হে মানুষ, আমি তোমাদের একজন পুরুষ এবং একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি। এরপর তোমাদের বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি যাতে তোমরা পরস্পরকে চিনতে পারো। নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট সেই সব থেকে বেশি সম্ভ্রান্ত, যার অন্তরে আল্লাহভীতি সব থেকে বেশি।

ব্যাখ্যা: আল্লাহ এখানে বলছেন, তিনি মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন একজন পুরুষ ও একজন মহিলা থেকে। এরপর তিনি তাদের বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছেন। তবে এই বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করার পেছনে তাঁর উদ্দেশ্য পরস্পর সম্মান ও মর্যাদা নির্ণয় করা নয় বরং পরস্পরকে সহজে চেনার ব্যবস্থা করা। এরপর আল্লাহ বলেছেন, তাঁর নিকট মানুষের সম্মান-মর্যাদার মাপকাঠি হচ্ছে আল্লাহভীতি। অর্থাৎ আল্লাহর ভয় যার অন্তরে যতি বেশি, আল্লাহর নিকট সে তত বেশি মর্যাদাশীল। আল্লাহর ভয়ই মানুষকে অন্যায় কাজ থেকে দূরে রাখে এবং ন্যায় কাজ করতে বাধ্য করে। তাহলে আল্লাহ বলছেন,

www.pathagar.com

ন্যায় কাজ করা বা বাস্তবায়ন করা এবং অন্যায় থেকে দূরে থাকা বা তা প্রতিরোধ করাই হচ্ছে মানুষের মর্যাদাশীল হওয়ার মাপকাঠি। বংশ, জাতি, ধনী-গরীব, কালো-সাদা, মনির-চাকর ইত্যাদি নিয়ে যেন অহংকার সৃষ্টি না হতে পারে, সে জন্যে তিনি কর্মপদ্ধতিও তৈরি করে দিয়েছেন। সেই কর্মপদ্ধতি হচ্ছে 'জামায়াতে নামাজ'। একজন মুসলমান দিনে পাঁচবার জামায়াতে নামাজের সময় তার বংশ, ভাষা, গায়ের রং, অর্থনৈতিক, সামাজিক ইত্যাদি পরিচয় ভুলে গিয়ে অন্য মুসলমান ভাইয়ের সঙ্গে এক লাইনে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়িয়ে যায়। এ সময় মনিবের পাশেই তাঁর ভৃত্য দাঁড়াতে পারে বা মনিবের মাথা যেয়ে লাগতে পারে সামনের কাতারে দাঁড়ানো তাঁর ভৃত্যের পায়ের গোঁড়ালিতে। এভাবে দিনে পাঁচবার বাস্তব প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মুসলমানদের অন্তর থেকে বংশ, বর্ণ, ভাষা, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিচয়ভিত্তিক অহংকার সমূলে দূর করার অপূর্ব ব্যবস্থা করা হয়েছে। সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার এমন অপূর্ব প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা খুঁজে পাবেন কি অন্য কোন জীবন ব্যবস্থায়?

৩. সামাজিক শৃঙ্খলার শিক্ষা

সামাজিক শৃঙ্খলা ব্যতীত কোন জাতি উন্নতি করতে পারে না। জামায়াতে নামাজের মাধ্যমে মুসলমানদের সামাজিক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার অপূর্ব শিক্ষা দেয়া হয়েছে। হাজার হাজার মুসলমানও যদি জামায়াতে দাঁড়ায়, তবুও দেখবেন, সোজা লাইনে দাঁড়িয়ে, কী সুন্দর শৃঙ্খলার সঙ্গে তারা একটি কাজ করছে। এর মাধ্যমে আল্লাহ মুসলমানদের শিক্ষা দিতে চাচ্ছেন, তারা যেন ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের প্রতিটি কাজ সুশৃঙ্খলভাবে করে। এত সুন্দর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও বর্তমান বিশ্বে মুসলমানদের সামাজিক শৃঙ্খলার অবস্থা দেখলে সত্যিই দুঃখ হয়।

৪. সমাজ পরিচালনা পদ্ধতির বাস্তব শিক্ষা

মানবসমাজের সুখ, শান্তি, উন্নতি, প্রগতি ইত্যাদি নির্ভর করে সুষ্ঠুভাবে সমাজ পরিচালনার ওপর। সুষ্ঠুভাবে সমাজ পরিচালনা করতে হলে কী কী বিষয় দরকার, জামায়াতে নামাজ পড়ার মাধ্যমে আল্লাহ প্রতিদিন পাঁচ বার তা মুসলমানদের মনে করিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করেছেন। সেই বিষয়গুলো হচ্ছে-

ক. নেতা নির্বাচন করা

জামায়াতে নামাজের সময়, একের অধিক লোক হলেই একজন ইমাম বা নেতা বানাতে হয়। এখান থেকে আল্লাহ শিক্ষা দিচ্ছেন, কোন সামাজিক কর্মকাণ্ড, যেখানে একের অধিক লোক জড়িত, তা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে হলে একজন নেতা অবশ্যই নির্বাচন করতে হবে।

www.pathagar.com

খ. পুরুষ না মহিলা নেতা

জামায়াত যদি শুধু পুরুষের হয় বা পুরুষ ও মহিলা মিশ্রিত হয়, তাহলে পুরুষ ইমাম হবে। কিন্তু জামায়াত যদি শুধু মহিলাদের হয়, তবে সেখানে মহিলা ইমাম হতে পারবে। এ থেকে আল্লাহ শিক্ষা দিতে চাচ্ছেন, যে সকল সামাজিক কর্মকাণ্ড পুরুষ ও মহিলা অধ্যুষিত বা শুধু পুরুষ অধ্যুষিত, সেখানে পুরুষই নেতা হবে। আর যে সকল সামাজিক কর্মকাণ্ড শুধু মহিলা অধ্যুষিত, সেখানে মহিলা নেতা হতে পারবে।

এর কারণ হল, পুরুষ ও মহিলা মিশ্রিত সামাজিক কর্মকাণ্ড সুষ্ঠুভাবে চালাতে হলে, একটি বিশেষ দৈহিক, বুদ্ধি-বৃত্তিক ও মানসিক গঠন দরকার। যিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন, তিনিই সব থেকে ভাল জানেন, ঐ ধরনের সামাজিক কর্মকাণ্ডে নেতৃত্ব দেয়ার জন্যে ঐ তিনটি গুণের প্রয়োজনীয় সমন্বয় কার মধ্যে অপেক্ষাকৃত ভাল আছে। এ বিষয়টি বিবেচনা করে তিনি পুরুষকেই সে দায়িত্ব দিয়েছেন। আর এটি অত্যন্ত সুন্দরভাবে আল্লাহ বলেছেন, সূরা নিসার ৩৪ নং আয়াতে। আয়াতটি হচ্ছে–

الرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ

অর্থঃ পুরুষেরা হচ্ছে নারীর পরিচালক। কারণ, আল্লাহ তাদের একজনকে অপরের উপর বিশিষ্টতা দান করেছেন।

ব্যাখ্যাঃ আল্লাহ এখানে স্পষ্ট করে বলেছেন যে, পুরুষ হচ্ছে নারীর পরিচালক। এরপর তিনি এর কারণটি বলেছেন। কারণটি হল পুরুষকে নারীর ওপর বিশিষ্টতা দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ পরিচালনা করা বা নেতৃত্ব দেয়ার জন্যে যে সব দৈহিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও মানসিক বিশিষ্টতা দরকার, সে ব্যাপারে পুরুষকে নারীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে। বিষয়টি চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতেও সত্য। মানুষেরা যদি এই সৃষ্টির রহস্যভিত্তিক কথা না মানে, তবে ভোগান্তি হবে তাদের, আল্লাহর নয়।

আল্লাহ কথাটি কুরআনে উল্লেখ করেই থেমে থাকেননি, প্রতিদিন পাঁচ বার নামাজের মাধ্যমে তা স্মরণ করিয়ে দেয়া এবং বাস্তবে প্রয়োগ করে দেখিয়ে দেয়ারও ব্যবস্থা করেছেন।

গ. নেতা হওয়ার জন্যে প্রয়োজনীয় গুণাগুণ

একটি সমাজের বা দেশের নেতার উপর অনেকাংশে নির্ভর করে, ঐ সমাজ বা দেশের ভবিষ্যৎ কী হবে। একজন ভাল নেতা যেমন একটি সমাজ বা দেশকে দ্রুত সব দিক থেকে উন্নতির দিকে নিয়ে যেতে পারেন, ঠিক তেমনি একজন খারাপ নেতা একটি সমাজ বা দেশকে দ্রুত ধ্বংসের দিকে নিয়ে যেতে পারে।

www.pathagar.com

তাই যে গুণাবলী থাকলে কোন ব্যক্তি নেতা হতে পারবে, তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই গুণগুলো রাসূল সা. সুন্দরভাবে মুসলমানদের জানিয়ে দিয়েছেন, নামাজের ইমাম হওয়ার গুণাবলী বর্ণনাকারী নিম্নের হাদীসগুলোর মাধ্যমে-

তথ্য-১

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كَانُوا فِيْ الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا وَلاَ يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ وَلا يَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ.رواه مسلم و في رواية لَّهُ وَلاَ يَؤُمَّنَّ الرَّجُلَ فِيْ اَهْلِهِ.

অর্থঃ হযরত আবু মাসউদ রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : মানুষের ইমামতি করবে সে-ই, যে কুরআন ভাল পড়ে। যদি কুরআন পড়ায় সকলে সমান হয়, তবে যে সুন্নাহ বেশি জানে। যদি সুন্নাহেও সকলে সমান হয়, তবে যে হিজরত করেছে সে। যদি হিজরতেও সকলে সমান হয়, তবে যে বয়সে বেশি। কেউ যেন অপর ব্যক্তির অধিকার ও ক্ষমতাস্থলে ইমামতি না করে এবং তার বাড়িতে তার সম্মানের স্থলে না বসে অনুমতি ব্যতীত। (মুসলিম)

ব্যাখ্যাঃ কুরআন ভাল পড়ার অর্থ হচ্ছে শুদ্ধ করে পড়াসহ কুরআনের জ্ঞান থাকা। তাই এ হাদীসটিতে রাসূল সা. ইমাম হওয়ার জন্যে প্রয়োজনীয় গুণাগুণ বা যোগ্যতাগুলো যে ক্রম অনুযায়ী উল্লেখ করেছেন, তা হচ্ছে-

ক. শুদ্ধ করে পড়াসহ কুরআনের জ্ঞান থাকা,
খ. সুন্নাহ তথা হাদীসের জ্ঞান থাকা,
গ. হিজরত করা এবং
ঘ. বেশি বয়স।

তথ্য-২

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانُوا ثَلاَثَةً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَحَدُهُمْ وَأَحَقُّهُمْ بِالْإِمَامَةِ أَقْرَؤُهُمْ. (رواه مسلم) وَ ذَكَرَ حَدِيْثَ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ فِيْ بَابِ بَعْدَ فَضْلِ الاَذَانِ.

www.pathagar.com

অর্থ: হযরত আবু সায়ীদ খুদরী রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : যখন তিন ব্যক্তি হবে, তখন যেন তাদের মধ্য হতে একজন ইমামতি করে এবং ইমামতির অধিকার তার, যে কুরআন অধিক ভাল পড়ে। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা: এ হাদীসখানিতে রাসূল সা. বলেছেন, নামাজের ইমাম সেই হবে যে শুদ্ধ করে পড়াসহ কুরআনের জ্ঞান অধিক রাখে।

তথ্য-৩

عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ قَالَ كُنَّا بِمَاءٍ مَمَرَّ النَّاسِ وَكَانَ يَمُرُّ بِنَا الرُّكْبَانُ فَنَسْأَلُهُمْ مَا لِلنَّاسِ مَا هَذَا الرَّجُلُ فَيَقُوْلُوْنَ يَزْعُمُ أَنَّ اللهَ أَرْسَلَهُ أَوْحَى إِلَيْهِ كَذَا فَكُنْتُ أَحْفَظُ ذَلِكَ الْكَلاَمَ وَكَأَنَّمَا يُقَرُّ فِي صَدْرِي وَكَانَتِ الْعَرَبُ تَلَوَّمُ بِاِسْلاَمِهِمُ الْفَتْحَ فَيَقُوْلُوْنَ اُتْرُكُوْهُ وَقَوْمَهُ فَإِنَّهُ إِنْ ظَهَرَ عَلَيْهِمْ فَهُوَ نَبِيٌّ صَادِقٌ فَلَمَّا كَانَتْ وَقْعَةُ أَهْلِ الْفَتْحِ بَادَرَ كُلُّ قَوْمٍ بِاِسْلاَمِهِمْ وَبَدَرَ أَبِي قَوْمِي بِاِسْلاَمِهِمْ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ جِئْتُكُمْ وَاللهِ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقًّا فَقَالَ صَلُّوا صَلَوةَ كَذَا فِي حِيْنِ كَذَا وَصَلُّوا صَلَوةَ كَذَا فِي حِيْنِ كَذَا فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَوةُ فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا فَنَظَرُوا فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَكْثَرَ قُرْآنًا مِنِّي لِمَا كُنْتُ أَتَلَقَّى مِنَ الرُّكْبَانِ فَقَدَّمُوْنِي بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ وَأَنَا ابْنُ سِتٍّ أَوْ سَبْعِ سِنِيْنَ.

অর্থ: আমর ইবনে সালেমা রা. বলেন, আমরা লোক চলাচলের পথে একটি কূপের নিকট বাস করতাম, যেখান দিয়ে আরোহীগণ চলাচল করত। আমরা তাদের জিজ্ঞাসা করতাম, মানুষের কী হল? তারা যে লোকটি সম্বন্ধে বলে তিনি কে? তারা উত্তর করত, লোকটি মনে করে তাকে আল্লাহ রাসূল করে পাঠিয়েছেন এবং তার প্রতি এইরূপ ওহী নাযিল করেছেন। তখন আমি ওহীর বাণীটি এমনভাবে মুখস্থ করে নিতাম যে তা আমার অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে যেত। আরবগণ যখন ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে মক্কা বিজয়ের অপেক্ষা করছিল, তখন তারা বলত তাকে (মুহাম্মাদকে) তার গোত্রের সাথে বুঝতে দাও। যদি সে তাদের উপর জয়লাভ করে তখন বুঝা যাবে, সে সত্য নবী। যখন মক্কা বিজয়ের ঘটনা ঘটল, তখন সকল গোত্রই ইসলাম গ্রহণে তাড়াহুড়ো করল এবং আমার পিতা গোত্রের

www.pathagar.com

অন্য সকলের আগে ইসলাম গ্রহণ করলেন। তিনি গোত্রে ফিরে এসে বললেন, আল্লাহর কসম আমি তোমাদের নিকট এক সত্য নবীর নিকট থেকে ফিরে এসেছি। তিনি বলে থাকেন, এই নামাজ এই সময় পড়বে এবং ঐ নামাজ ঐ সময় পড়বে। যখন নামাজের সময় উপস্থিত হবে, তখন তোমাদের মধ্য হতে কেউ যেন আযান দেয় এবং তোমাদের মধ্যে ইমামতি যেন সেই ব্যক্তি করে যে অধিক কুরআন জানে। তখন লোকেরা দেখল, আমার অপেক্ষা অধিক কুরআন জানে এমন কেউ নেই। কেননা আমি পথিকদের নিকট হতে পূর্বেই তা মুখস্থ করে নিয়েছিলাম। তখন তারা আমাকেই তাদের আগে বাড়িয়ে দিল অথচ তখন আমি ছয় কি সাত বছরের বালকমাত্র। ..... (বুখারী)

ব্যাখ্যাঃ এ হাদীসটি থেকে বুঝা যায়, নামাজের ইমাম হওয়ার জন্যে কুরআনের জ্ঞান থাকা বয়সের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

তথ্য-৪

عَنِ بْنِ عُمَرَ قَالَ لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُوْنَ الْأَوَّلُوْنَ الْمَدِيْنَةَ كَانَ يَؤُمُّهُمْ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ وَ فِيْهِمْ عُمَرُ وَ اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الأَسَدِ. رواه البخارى

অর্থঃ ইবনে উমর রা. বলেন, রাসূল সা. এর হিজরতের পূর্বে যখন প্রথম মুহাজির দল মদীনা পৌঁছলেন, তখন আবু হুযায়ফার গোলাম সালেম রা. তাদের ইমামতি করতেন। অথচ তাদের মধ্যে তখন ওমর এবং আবু সালামা ইবনে আবদুল আসাদের ন্যায় লোকও বিদ্যমান ছিলেন। (বুখারী)

ব্যাখ্যাঃ হযরত সালেহ একদিকে যেমন কুরআনের বড় জ্ঞানী ছিলেন, অপরদিকে তিনি বড় কারীও ছিলেন। রাসূল সা. যে চার ব্যক্তির নিকট থেকে কুরআন শিখতে বলেছিলেন, তিনি তাঁদের অন্যতম।

এ হাদীসটি থেকে বুঝা যায়, ইমাম হওয়ার যোগ্যতার মধ্যে শুদ্ধ করে পড়াসহ কুরআনের জ্ঞান থাকার গুরুত্ব বংশ, গোত্র, দেশ অথবা মনিব, গোলাম ইত্যাদির চেয়ে ওপরে।

তথ্য-৫

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِسْتَخْلَفَ ابْنَ أُمِّ مَكْتُوْمٍ يَؤُمُّ النَّاسَ وَهُوَ أَعْمَى. رواه ابو داؤد

অর্থঃ আনাস রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. ইবনে উম্মে মাকতুমকে নামাজে লোকের ইমামতি করার জন্যে আপন প্রতিনিধি নিযুক্ত করেছিলেন অথচ তিনি ছিলেন অন্ধ। (আবু দাউদ)

www.pathagar.com

ব্যাখ্যা: হাদীসটি থেকে বুঝা যায়, নামাজের ইমাম হওয়ার যোগ্যতার মধ্যে শারীরিক পূর্ণতা বা সৌন্দর্যের গুরুত্ব অন্য যোগ্যতার গুরুত্বের চেয়ে কম। তাই সে সৌন্দর্য বা পূর্ণতা শরীরের রং, গঠন, পরিপূর্ণতা অথবা পোশাক-পরিচ্ছদের মূল্য বা কাটিং ইত্যাদি যে কিছুর জন্যেই হোক না কেন।

❑❑ উল্লিখিত ৫টি হাদীসের সরলার্থ থেকে নিশ্চয়তা দিয়েই বলা যায়, নামাজের ইমাম হওয়ার যোগ্যতা বা গুণাগুণগুলোর প্রথম চারটিকে গুরুত্বের ক্রম অনুযায়ী রাসূল সা. যেভাবে সাজিয়ে দিয়েছেন বা উল্লেখ করেছেন, তা হচ্ছে–

ক. শুদ্ধ করে কুরআন পড়াসহ কুরআনের জ্ঞান থাকা,

খ. হাদীসের জ্ঞান থাকা,

গ. হিজরত করা এবং

ঘ. বয়স।

শরীরের রং, গঠন, পরিপূর্ণতা, বংশ, গোত্র, দেশ, অথবা পোশাক-পরিচ্ছদের মূল্য, কাটিং ইত্যাদি সাধারণত ইমাম হওয়ার কোন গুণ বা যোগ্যতা নয়। তবে যেটি হওয়ার সম্ভাবনা একেবারেই কম তেমনটি কখনো হলে অর্থাৎ একাধিক ব্যক্তি উপরের চারটি যোগ্যতার দৃষ্টিকোণ থেকে একেবারেই সমান হলে, কে বেশি যোগ্য সেটি নির্ণয়ের জন্যে ঐ 'বিষয়গুলো বিবেচনায় আসতে পারে।

ইমামের যোগ্যতা নির্ণয়ের ব্যাপারে রসূল সা. কর্তৃক উল্লিখিত প্রথম তিনটি বিষয়ের দৃষ্টিকোণ থেকে কোন ব্যক্তিকে যথাযথভাবে যাচাই করতে হলে ঐ তিনটি বিষয়কে নিম্নোক্তভাবে আরো একটু বিস্তারিত জানতে হবে–

শুদ্ধ করে পড়াসহ কুরআনের জ্ঞান থাকা

যে কোন ভাষা শিক্ষার প্রথম স্তর হচ্ছে ঐ ভাষা শুদ্ধ করে পড়া শিখা। পড়া শুদ্ধ না হলে অর্থ পাল্টে যায়। তাই আল-কুরআনসহ সকল গ্রন্থ পড়ার সময় ইমামসহ সকলের পড়া শুদ্ধ হওয়া অবশ্যই দরকার।

কোন ব্যাপক বিষয়ের (Vast Subject) সকল দিকের বিস্তারিত জ্ঞান থাকা সকল মানুষের জন্যে সাধারণভাবে সম্ভব নয়। তাই স্বতঃসিদ্ধভাবে কোন ব্যাপক বিষয়ে জ্ঞানী লোকদের নিম্নোক্তভাবে ভাগ করা হয়–

- ❑ সাধারণ জ্ঞানী– যার ঐ ব্যাপক বিষয়ের সকল দিকের (All spciality) মৌলিক জ্ঞান আছে।
- ❑ বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী– যার সকল দিকের মৌলিক জ্ঞান আছে এবং এক বা একাধিক দিকের (Speciality) বিস্তারিত জ্ঞান আছে। এ স্তরে অবস্থানকারীদের মধ্যে তাকেই বেশি জ্ঞানী বলা হবে, যার বেশি সংখ্যক দিক (Speciality) সম্বন্ধে বিস্তারিত জ্ঞান আছে।

www.pathagar.com

- ❑ জ্ঞানী নয়– যার এক বা একাধিক দিক (Speciality) সম্বন্ধে মৌলিক জ্ঞানের অভাব আছে।

একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি আরো পরিষ্কার হবে। ধরুন, ডাক্তারি বিদ্যা। এখানে এনাটমি, ফিজিওলজি, প্যাথোলজি, মেডিসিন, সার্জারি, গাইনি, চক্ষু, নাক-কান-গলা, অর্থোপেডিক্স ইত্যাদি অনেক বিভাগ (Speciality) আছে। এই সকল বিষয়ে একজন ডাক্তারের পক্ষে বিস্তারিত জ্ঞান থাকা সম্ভব নয় বলে জ্ঞানের পরিব্যাপ্তির দৃষ্টিকোণ থেকে ডাক্তারদের নিম্নোক্তভাবে ভাগ করে নেয়া হয়েছে–

- ❑ সাধারণ জ্ঞানী অর্থাৎ অবিশেষজ্ঞ (Non-specialist) ডাক্তার– এ ডাক্তাররা হচ্ছেন তারা যাদের ডাক্তারি বিদ্যার সকল বিভাগের (All Speciality) মৌলিক জ্ঞান আছে।
- ❑ বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী অর্থাৎ বিশেষজ্ঞ (Specialist) ডাক্তার– এ ডাক্তাররা হচ্ছে তারা যাদের ডাক্তারী বিদ্যার সকল বিভাগের মৌলিক জ্ঞান আছে এবং একটি বিভাগের (Speciality) বিস্তারিত জ্ঞান আছে।
- ❑ জ্ঞানী নয় অর্থাৎ ডাক্তার নয়– যার এক বা একাধিক বিভাগের মৌলিক জ্ঞানের অভাব আছে।

এবার চলুন, কোন বিষয়ে জ্ঞানী হওয়া বা না হওয়ার এই স্বতঃসিদ্ধ (Eternal Truth) তথ্যের আলোকে কুরআনের জ্ঞানী হওয়ার বিষয়টি পর্যালোচনা করা যাক–

পবিত্র কুরআন হচ্ছে মানুষের দুনিয়ার জীবন সুখী, সমৃদ্ধ ও প্রগতিশীলভাবে পরিচালনার মাধ্যমে পরকালে পুরস্কৃত হওয়ার লক্ষ্যে আল্লাহপ্রদত্ত গাইডবুক বা হেদায়েত। তাই দুনিয়ায় মানুষের জীবন নির্ভুলভাবে পরিচালনার জন্যে যত বিষয় প্রয়োজন, তার সকল বিষয় সম্পর্কে অবশ্যই কুরআনে বক্তব্য আছে। সেই বিষয়গুলোর মধ্যে প্রধান কয়েকটি হচ্ছে–

১. তাওহীদ (আল্লাহর একত্ববাদ), রেসালাত (নবী-রাসূল), আখিরাত, ফেরেশতা, কিতাব ইত্যাদি।
২. নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি উপাসনাস্বরূপ ইবাদত।
৩. সমাজের একজনের সঙ্গে আর একজনের আচার-ব্যবহার, দায়িত্ব ও কর্তব্য অর্থাৎ সমাজবিজ্ঞান (Social Science)।
৪. বিবাহ, তালাক।
৫. উত্তরাধিকারদের মধ্যে সম্পদের বণ্টন।
৬. বিচারব্যবস্থা ও ফৌজদারী দণ্ডবিধি। বিচারক ও সাক্ষীর দায়িত্ব ও কর্তব্য ইত্যাদি।
৭. শিক্ষাব্যবস্থা।
৮. অর্থনীতি।

www.pathagar.com

৯. ব্যবসা-বাণিজ্য।
১০. বিজ্ঞান।
১১. যুদ্ধবিদ্যা, যুদ্ধাস্ত্র, যুদ্ধনীতি ইত্যাদি।
১২. আন্তর্জাতিক নিয়ম-নীতি, সন্ধি ইত্যাদি।
১৩. রাষ্ট্রবিজ্ঞান (Political Science)।

তাহলে পূর্বোল্লিখিত কোন বিষয়ের জ্ঞানী হওয়ার স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম অনুযায়ী কুরআনের জ্ঞান থাকার বিভিন্ন পর্যায় (Grade) হবে নিম্নরূপ–

- ❑ বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী– যার কুরআনে উল্লেখিত সকল বিষয়ের মৌলিক জ্ঞান আছে এবং এক বা একাধিক বিষয়ে বিস্তারিত জ্ঞান আছে।
  এ স্তরে যার কুরআনে উল্লেখ থাকা বেশি সংখ্যক বিষয়ের বিস্তারিত জ্ঞান থাকবে, তাঁকে অধিক জ্ঞানী বলা বা ধরা হবে।
- ❑ সাধারণ জ্ঞানী– যাঁর কুরআনে উল্লেখিত সকল বিষয়ে মৌলিক জ্ঞান আছে।
- ❑ জ্ঞানী নয়– যার কুরআনে উল্লেখিত এক বা একাধিক বিষয়ে মৌলিক জ্ঞানের অভাব আছে।

হাদীসের জ্ঞান থাকা

নামাজের ইমামতি তথা সমাজের নেতা হওয়ার দ্বিতীয় প্রয়োজনীয় বিষয় (Requirement) হিসেবে রাসূল সা. হাদীসের জ্ঞান থাকাকে উল্লেখ করেছেন। কুরআনের সকল বিষয়ের ব্যাখ্যা হাদীসে আছে, তাই হাদীস পড়লেই তো ইসলামের সকল বিষয় ব্যাখ্যাসহকারে জানা যায়। কিন্তু রাসূল সা. ইমামতি করার ব্যাপারে কুরআনের জ্ঞান থাকাকে হাদীসের জ্ঞান থাকার আগে তথা হাদীসের জ্ঞান থাকার চেয়ে বেশি প্রয়োজন বলেছেন। তিনি কি বিনা কারণে এটি বলেছেন? অবশ্যই না। ব্যাপারটি আজ বিশ্ব মুসলমানদের অত্যন্ত ভাল করে বুঝতে হবে। আর তা বুঝতে হলে কুরআন ও হাদীস সম্বন্ধে নিম্নের তথ্যগুলো জানতে হবে–

ক. মৌলিক-অমৌলিক আমলের পার্থক্য নির্ণয়ের অসুবিধা

কুরআন-সুন্নাহ পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ইসলামের বিষয়গুলো প্রধানত মৌলিক ও অমৌলিক– এ দু'ভাগে বিভক্ত। মৌলিক বিষয়গুলো আবার প্রথম স্তর ও দ্বিতীয় স্তর, এ দু'ভাগে বিভক্ত। প্রথম স্তরের মৌলিক বিষয়গুলো হচ্ছে সেগুলো, যেগুলোর একটিও ইচ্ছাকৃতভাবে বা ছোটখাট ওজরের কারণে পালন না করলে একজন মানুষকে সরাসরি (Directly) জাহান্নামে যেতে হবে। দ্বিতীয় স্তরের মৌলিক বিষয়গুলো হচ্ছে প্রথম স্তরের মৌলিক বিষয়গুলোর বাস্তবায়ন পদ্ধতির মৌলিক বিষয়। এগুলোর একটি ইচ্ছাকৃতভাবে বা ছোট ছোট ওজরের কারণে পালন না করলেও একজন মুসলমানকে জাহান্নামে যেতে হবে, তবে এ

www.pathagar.com

জাহান্নামে যাওয়ার কারণ হবে পরোক্ষ (Indirect)। কারণ দ্বিতীয় স্তরের একটি মৌলিক বিষয় পালন না করলে ঐ বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত প্রথম স্তরের মৌলিক কাজটি ব্যর্থ হবে আর তাই তাকে জাহান্নামে যেতে হবে। আর অমৌলিক আমলগুলোর সবটিও যদি কেউ ঘৃণা বা অস্বীকার না করে, কোন গ্রহণযোগ্য কারণের (ওজর) জন্যে পালন না করতে পারে, তবে তার জন্যে তাকে জাহান্নামে যেতে হবে না। এ জন্য শুধু তার বেহেশতের মান (Grade) কমবে।

সূরা নাহলের ৮৯ নং আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন, আল-কুরআনে তিনি ইসলামের সকল প্রথম স্তরের মৌলিক বিষয় উল্লেখ করেছেন। দ্বিতীয় স্তরের মৌলিক বিষয়ের সবগুলো কুরআনে উল্লেখিত নেই। কিছু আছে শুধু সুন্নাহ তথা হাদীসে। আর অমৌলিক আমলের প্রায় সবই আছে শুধু হাদীসে। কিন্তু শুধু হাদীস পড়ে এটি বুঝা অসম্ভব যে, কোন্ আমলগুলো মৌলিক আর কোন্গুলো অমৌলিক। তাই যদি শুধু হাদীস পড়েই ইসলামকে জানার ব্যবস্থা চালু হয়, তবে মুসলমানরা ইসলামের কোন্ বিষয়গুলো মৌলিক আর কোন্ বিষয়গুলো অমৌলিক, তা বুঝতে পারবে না। ফলে ইসলাম পালনের সময় তারা অমৌলিক বিষয়গুলো মৌলিক বিষয়গুলোর থেকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে পালন করতে থাকবে, যা তারা বর্তমানে করছে। যে কোন জীবনব্যবস্থা ব্যর্থ হওয়ার জন্যে এটি একটি অত্যন্ত বড় কারণ। ইসলামের মৌলিক ও অমৌলিক বিষয়ের মহা ক্ষতিকর এই মিশ্রণ এড়ানোর জন্যে রাসূল সা. মক্কী জীবনে, হাদীস লিপিবদ্ধ করাকে নিষেধ করেছেন। অথচ কুরআন নাযিলের সাথে সাথে তিনি তা লিপিবদ্ধ ও মুখস্থ করার ব্যবস্থা করেছেন।

খ. কুরআন বানানো বা পরিবর্তন করা অসম্ভব কিন্তু হাদীসের ব্যাপারে তা সম্ভব

ইসলামের শত্রুরা বা ইসলামের অতি ভক্তরা, রাসূল সা. যে সব কথা, কাজ বা সমর্থন করেননি, তেমন বিষয়কেও হাদীস বলে চালিয়ে দিয়েছে, দিচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও দিবে। কারণ হাদীস বানানো বা পরিবর্তন করা সম্ভব। এরকম অসংখ্য হাদীস বানানো বা পরিবর্তন করা হয়েছে বলেই ইমাম বুখারী রা. ৬ (ছয়) লক্ষ হাদীস বাছাই করে দ্বিরুক্তি বাদ দিয়ে মাত্র ২৬০২-২৭৬১টি হাদীসকে বুখারী শরীফে উল্লেখ করার মত যোগ্যতাসম্পন্ন পেয়েছেন।

পক্ষান্তরে কুরআনের একটি ছোট আয়াতও কেয়ামত পর্যন্ত কেউ বানাতে পারবে না। এটি কুরআনে আল্লাহ ঘোষণা করেছেন এভাবে–

وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُوْنَ.

অর্থ: এটা নিশ্চিত যে, আমি এ কিতাব সংরক্ষণ করব। (আল হিজর : ৯)

www.pathagar.com

গ. মিথ্যা হাদীস শনাক্ত করার উপায়

হাদীসের গ্রন্থসমূহে মিথ্যা হাদীস শনাক্ত করার উপায় হিসাবে হাদীস বর্ণনাকারীদের (রাবী) চরিত্র, মেধা, স্মরণশক্তি, ইসলাম পালন, পরিচিতি, বর্ণনাকারীর সংখ্যা ইত্যাদি বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করা হয়েছে। যে সব হাদীসের বর্ণনাকারী (রাবী) উপরোক্ত গুণাগুণের বিচারে উত্তীর্ণ হয়েছেন তাঁদের বর্ণনাকৃত হাদীসকে সহীহ হাদীস হিসেবে ধরা হয়েছে। কারণ, এটি ধরে নেয়া হয়েছে যে, উপরোক্ত গুণাবলী যে ব্যক্তির মধ্যে আছে, তিনি মিথ্যা হাদীস বা বানানো হাদীস বলতে পারেন না। হাদীসের গ্রন্থসমূহে হাদীসের বক্তব্য বিষয়কে (মতন), হাদীসটি সহীহ হওয়ার ব্যাপারে, বিবেচ্য বিষয় (Criteria) হিসেবে ধরা হয় নাই।

তাই যদি দেখা যায়, কোন হাদীসের বক্তব্য কুরআনের কোন স্পষ্ট বক্তব্যের বিরোধী, তবে নির্দ্বিধায় বলতে হবে সে হাদীসটি বানানো বা হাদীসটির ব্যাখ্যা ভুল করা হয়েছে। কারণ কুরআনের স্পষ্ট বক্তব্যের বিরোধী কোন কথা, কাজ বা সমর্থন রাসূল সা. অবশ্যই করতে পারেন না। এ বিষয়টি সকল মুসলমানের নিকট অত্যন্ত পরিষ্কার থাকা দরকার। হাদীস সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে 'হাদীসশাস্ত্র অনুযায়ী সহীহ হাদীস বলতে নির্ভুল হাদীস বুঝায় কি?' নামক বইটিতে।

ঘ. সকল সুন্নাহ হাদীস গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হওয়া না হওয়া

রাসূল সা. কুরআনের সঙ্গে সুন্নাহের মিশ্রণ এড়ানোর জন্যে মক্কী জীবনে হাদীস লিখতে নিষেধ করেছেন। খুলাফায়ে রাশেদীনগণ হাদীস সংকলনের বিরোধী ছিলেন। তাই প্রকৃতভাবে হাদীস সংকলন করা শুরু হয় তাঁর ইন্তেকালের ১৭৫ বছরেরও পরে। তাছাড়া রাসূল সা. তাঁর উদ্ধৃতি দিয়ে ভুল বা বানানো কথা বলাকে একটি অতি বড় গুনাহের বিষয় বলে বারবার উল্লেখ করেছেন। তাই জানা থাকলেও নির্ভুলতার ব্যাপারে সামান্য সন্দেহ থাকলে বহু সাহাবী অনেক হাদীস বর্ণনা করেননি। সুতরাং সকল সুন্নাহ হাদীস গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়েছে এ কথা নিশ্চয়তা দিয়ে বলা যাবে না বা যায় না।

ঙ. হাদীস গ্রন্থের ভাণ্ডার অনেক বড় হওয়া এবং হাদীস হুবহু মুখস্থ রাখা কঠিন হওয়া

কুরআনের চেয়ে হাদীসের ভাণ্ডার অনেক বড় এবং তা মনে রাখাও কঠিন। তাই তো কুরআনের হাফিজের সংখ্যার তুলনায় হাদীসের হাফিজের সংখ্যা একেবারেই নগণ্য।

হিজরত করা

নামাজের ইমাম হওয়ার গুণাবলীর (Quality) মধ্যে রাসূল সা. তিন নম্বরে উল্লেখ করেছেন হিজরত করাকে। হিজরত ইসলামের একটি আমল বা কাজ । সুতরাং হিজরত করা বলতে রাসূল সা. বুঝিয়েছেন ইসলামের আমল বা কাজ করাকে। হিজরত বর্তমানে সাধারণভাবে চালু নাই। তাই বর্তমান বিশ্ব

www.pathagar.com

মুসলমানদের এটি ভাল করে বুঝতে হবে যে, নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত, তাসবীহ-তাহলিল, যিকির-আযকারসহ ইসলামের অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ কাজ থাকা সত্ত্বেও রাসূল সা. কেন ইমাম হওয়ার তিন নাম্বার গুণ (Quality) হিসেবে এমন একটি আমলের নাম উল্লেখ করেছেন, যা সাধারণভাবে চালু নেই। ব্যাপারটি বুঝতে হলে হিজরত সম্বন্ধে নিম্নের তথ্যগুলো মনে রাখতে হবে–

হিজরতের অর্থ

হিজরত ইসলামের একটি পরিভাষা। এর অর্থ হচ্ছে, একটি বিশেষ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে নিজ জন্মভূমি, আত্মীয়-স্বজন, সহায়-সম্পত্তি ছেড়ে স্থায়ীভাবে অন্য স্থানে চলে যাওয়া।

হিজরতের উদ্দেশ্য

রাসূল সা. এর দুনিয়ায় আসার উদ্দেশ্য হচ্ছে, আল্লাহর মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে অর্থাৎ আল্লাহর সন্তুষ্টিকে সামনে রেখে, মানুষের কল্যাণের জন্যে কুরআনে বর্ণিত সকল ন্যায়ের বাস্তবায়ন ও অন্যায়ের প্রতিরোধ করে, দুনিয়ার মানুষকে দেখিয়ে দেয়া। এ কাজটি শুধুমাত্র করা সম্ভব ইসলামকে বিজয়ী তথা শাসন ক্ষমতায় বসানোর মাধ্যমে।

নবুয়াত প্রাপ্তির পর রাসূল সা. মক্কায় ইসলামকে বিজয়ী শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে কার্যক্রম চালাতে থাকেন। কিন্তু ১৩ বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করার পর তিনি বুঝতে পারলেন, মক্কাতে ইসলামকে বিজয়ী করা সম্ভব নয়। কারণ সেখানকার অধিকাংশ মানুষ ছিল ইসলামের সক্রিয় বিরোধী। পক্ষান্তরে মদিনার অবস্থা ছিল ভিন্ন। সেখানকার অধিকাংশ মানুষ হয় ইসলামের পক্ষে, না হয় নিষ্ক্রিয় বিরোধী ছিল। অর্থাৎ আল্লাহর তৈরি প্রাকৃতিক আইন অনুযায়ী মক্কায় ইসলাম বিজয়ী হওয়া সম্ভব ছিল না কিন্তু মদিনায় তা ছিল। তাই তিনি নিজের প্রাণপ্রিয় জন্মভূমি, আত্মীয়-স্বজন ও সহায়-সম্পত্তি ছেড়ে আল্লাহর নির্দেশে মদিনায় হিজরত করার সিদ্ধান্ত নিলেন এবং হিজরত করলেন। মদিনায় পৌঁছে প্রথমেই তিনি ইসলামকে বিজয়ী শক্তি হিসেবে ঘোষণা করে একটি ছোট ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করেন।

'হিজরত' সম্বন্ধে উপরোক্ত তথ্য পর্যালোচনার পর এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, হিজরত ইসলামের এমন একটি আমল বা কাজ, যার উদ্দেশ্য ইসলামকে বিজয়ীশক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা এবং যেটি করতে অত্যন্ত কঠিন ত্যাগ স্বীকার করতে হয়।

এখন আশা করি, সবার নিকট পরিষ্কার হবে যে, নামাজের ইমাম হওয়ার জন্যে রাসূল সা. হিজরত নামক আমল বা কাজ দ্বারা ঐ সব কাজকে বুঝাতে চেয়েছেন, যার উদ্দেশ্য হবে ইসলামকে বিজয়ীশক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা এবং

www.pathagar.com

যা করতে যেয়ে কঠিন ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। তাই সহজে বুঝা যায়, ইমাম হওয়ার গুণাগুণের মধ্যে হিজরত করাকে তিন নম্বরে উল্লেখ করার মাধ্যমে রাসূল সা. জানিয়ে দিয়েছেন– ইমাম হওয়ার তিন নম্বর গুণ হবে এক ও দুই নম্বর গুণের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান অনুযায়ী আমল বা কাজ করা। আর আমলগুলোর গুরুত্বের ক্রম অনুযায়ী অবস্থান হবে–

১. ঐ সকল মৌলিক কাজ যার উদ্দেশ্য হবে দীনকে বিজয়ী করা এবং যা করতে মাল ও জানের প্রচণ্ড ত্যাগ স্বীকার করা লাগে।
২. ঐ সকল মৌলিক কাজ যা মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য বিভাগের মধ্যে পড়ে।
৩. ঐ সকল মৌলিক কাজ যা মানুষ সৃষ্টির পাথেয় বিভাগের মধ্যে পড়ে।
৪. ইসলামের অমৌলিক কাজ।

❑❑ তাহলে নামাজের মাধ্যমে মুসলিম সমাজ বা দেশের নেতা তথা কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় সরকার পরিষদের নেতা হওয়ার জন্যে যে গুণাবলীর প্রয়োজন হবে বলে আল্লাহ ও রাসূল সা. জানিয়ে দিয়েছেন, গুরুত্বের ক্রম অনুযায়ী সেগুলোর বিন্যাস হচ্ছে–

১. শুদ্ধ করে কুরআন পড়াসহ কুরআনের জ্ঞান থাকা। এখানে কুরআনের বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীকে সাধারণ জ্ঞানীর চেয়ে বেশি যোগ্য ধরতে হবে এবং বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদের মধ্যে যার কুরআনের বেশি সংখ্যক বিভাগের (Speciality) বিশেষ জ্ঞান আছে, তাকে বেশি যোগ্য ধরতে হবে।
২. হাদীসের জ্ঞান থাকা।
৩. আমল করা। আর আমল করার ব্যাপারে নিম্নের ক্রম অনুযায়ী যার আমল যত বেশি হবে, তাকে তত বেশি যোগ্য ধরতে হবে–
   ক. ঐ সকল মৌলিক আমল যার উদ্দেশ্য ইসলামকে বিজয়ী করা তথা শাসন ক্ষমতায় বসান এবং যা পালন করতে প্রচণ্ড ত্যাগ স্বীকার করা লাগে।
   খ. ঐ সকল মৌলিক আমল যা মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য বিভাগের মধ্যে পড়ে।
   গ. ঐ সকল মৌলিক আমল যা মানুষ সৃষ্টির পাথেয় বিভাগের মধ্যে পড়ে।
   ঘ. অমৌলিক আমল।
৪. বয়স।
৫. শারীরিক পরিপূর্ণতা, গায়ের রং, বংশ, গোত্র, দেশ, মনিব, গোলাম, পোশাক-পরিচ্ছদের মূল্য ও তৈরির ধরন ইত্যাদি নেতার যোগ্যতা যাচাইয়ের মানদণ্ডে তখনই শুধু আসতে পারে, যখন উপরের সকল গুণ একাধিক ব্যক্তির মধ্যে একই মানের হবে, যা একটি প্রায় অসম্ভব ব্যাপার।

www.pathagar.com

ঘ. নেতা নির্বাচন পদ্ধতির শিক্ষা

মুসলিমসমাজ বা দেশের নেতা তথা কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় সরকার পরিষদের নেতা কী পদ্ধতির মাধ্যমে নির্বাচন করতে হবে সেটি মহান আল্লাহ তাঁর রাসূলের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন নামাজের ইমাম নির্বাচনের পদ্ধতির মাধ্যমে, যা প্রত্যেক নামাজীকে প্রতিদিন পাঁচবার অনুশীলন করতে হয়। নামাজের ইমাম নির্বাচনের ঐ পদ্ধতি রাসূল সা. জানিয়ে দিয়েছেন নিম্নের হাদীসগুলোর মাধ্যমে–

তথ্য-১

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثَةٌ لاَ يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُمْ صَلَوتُهُمْ مَنْ تَقَدَّمَ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُوْنَ وَرَجُلٌ أَتَى الصَّلَوةَ دِبَارًا وَالدِّبَارُ أَنْ يَأْتِيَهَا بَعْدَ أَنْ تَفُوتَهُ وَرَجُلٌ اعْتَبَدَ مُحَرِّرَهُ.رواه ابو داؤد و ابن ماجة

অর্থ: ইবনে উমর রা. বলেন, রাসূল সা. বলেছেন, তিন ব্যক্তির নামাজ কবুল হবে না–ক. যে কোন গোত্র বা জাতির ইমাম হয়েছে অথচ তারা তাকে পছন্দ করে না, খ. যে নামাজ পড়তে আসে দিবারে। আর দিবার বলে নামাজের উত্তম সময়ের পরের সময়কে এবং গ. যে কোন স্বাধীন নারীকে দাসীতে পরিণত করে। (আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)।

ব্যাখ্যা: হাদীসটিতে রাসূল সা. বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন গোত্র বা জাতির ইমাম হয়েছে অথচ লোকেরা (অথ্যাৎ ঈমানদার জনগণ) তাকে পছন্দ করে না তার নামাজ কবুল হবে না। অর্থাৎ কোন গোত্র বা জাতির ইমামের নামাজ কবুল হতে তাকে অবশ্যই সকল বা অধিকাংশ মুক্তাদির সমর্থন তথা 'ভোট' নিয়েই ইমাম হতে হবে। সুতরাং সকল বা অধিকাংশ মুক্তাদি যাকে পূর্বোল্লিখিত গুণাগুণসমূহের ভিত্তিতে অধিক যোগ্য মনে করবে সেই নামাজের ইমাম হবে।

তথ্য-২

وَ عَنْ اَبِيْ اُمَامَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثَةٌ لاَ تُجَاوِزُ صَلَوتُهُمْ آذَانَهُمُ الْعَبْدُ الْآبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ وَإِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ. رواه الترمذى وَ قَالَ حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ.

www.pathagar.com

অর্থঃ আবু উমামা রা. বলেন, রাসূল সা. বলেছেন, তিন ব্যক্তির নামাজ তাদের কানের সীমা অতিক্রম করে না (অর্থাৎ কবুল হয় না) – ক. পলাতক দাস যতক্ষণ না সে ফিরে আসে, খ. যে নারী রাত্রি যাপন করেছে অথচ তার স্বামী তার ওপর অসন্তুষ্ট এবং গ. গোত্র বা জাতির ইমাম কিন্তু মানুষ (সঙ্গত কারণে) তাকে পছন্দ করে না। (তিরমিযী, তবে হাদীসটিকে তিরমিযী গরীব বলেছেন)

ব্যাখ্যাঃ এ হাদীসটি থেকেও বুঝা যায়, যে ব্যক্তি নামাজের ইমাম হয়েছে কিন্তু মানুষেরা তাকে সঙ্গত কারণে পছন্দ করে না, তার নামাজ কবুল হয় না বা হবে না। অর্থাৎ এ হাদীসটি থেকেও বুঝা যায়, নামাজের ইমাম হতে হবে সকল বা অধিকাংশ মুক্তাদির সম্মতি তথা ভোটের মাধ্যমে। এ হাদীসখানির মাধ্যমেও তাই রাসূল সা. জানিয়ে দিয়েছেন নামাজের ইমাম সেই হবে যাকে সকল বা অধিকাংশ মুক্তাদি পূর্বোল্লিখিত গুণাগুণের ভিত্তিতে অধিক যোগ্য মনে করবে।

তথ্য-৩

وَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلاَثَةٌ لاَ تَرْتَفِعُ صَلَوتُهُمْ فَوْقَ رُءُوسِهِمْ شِبْرًا رَجُلٌ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ. وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ وَأَخَوَانِ مُتَصَارِمَانِ. رواه ابن ماجه

অর্থঃ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, রাসূল সা. বলেছেন, তিন ব্যক্তির নামাজ তাদের মাথার উপর এক বিঘতও ওঠে না অর্থাৎ কখনই কবুল হয় না– ক. যে ব্যক্তি কোন গোত্র বা জাতির ইমাম হয় কিন্তু তারা (সঙ্গত কারণে) তাকে পছন্দ করে না, খ. সেই নারী যে রাত্রি যাপন করেছে অথচ তার স্বামী সঙ্গত কারণে তার ওপর নাখোশ এবং গ. সেই দুই ভাই যারা পরস্পরে বিচ্ছিন্ন। (ইবনে মাজাহ)

ব্যাখ্যাঃ এ হাদীসটি থেকেও বুঝা যায়, ইমাম হতে হলে অবশ্যই সকল বা অধিকাংশ মুক্তাদির সম্মতির (ভোটের) মাধ্যমে হতে হবে।

❑❑ উল্লিখিত তিনটি গুরুত্বপূর্ণ হাদীসের প্রত্যেকটিতে রাসূল সা. বলেছেন, যে ব্যক্তি নামাজের ইমাম হবে কিন্তু অধিকাংশ মুক্তাদি তাকে চায় না তথা পূর্বোল্লিখিত ইমাম হওয়ার গুণাগুণসমূহের ভিত্তিতে যোগ্য মনে করে না, তার নামাজ কবুল হবে না। অর্থাৎ পরকালে তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম। এই সকল হাদীসের আলোকে স্পষ্টভাবে নামাজের ইমাম নির্বাচনের ব্যাপারে যে বিধি-বিধান বের হয়ে আসে এবং যা প্রতিটি মুসলমান বাস্তব আমলের ভিত্তিতে দিনে পাঁচবার অনুসরণ করছে, তা হচ্ছে–

www.pathagar.com

ক. ভোট বা সমর্থনের মাধ্যমে সকল বা অধিকাংশ মুক্তাদি যাকে পূর্বোল্লিখিত গুণাগুণসমূহের ভিত্তিতে অধিকতর যোগ্য মনে করবেন তিনি নামাজের ইমাম হবেন। আর এই সমর্থন দিতে হবে সকল রকম অন্যায় প্রভাব মুক্ত হয়ে।

খ. ঐ পদ্ধতি অনুসরণ করে ইমাম নির্বাচন করা ইসলামের একটি মৌলিক বিধান। কারণ, রাসূল সা. বলেছেন, ঐ পদ্ধতি অনুসরণ না করে যে ইমাম হবে, তার নামাজ কবুল হবে না। সুতরাং তাকে জাহান্নামে যেতে হবে অর্থাৎ তার সকল কর্মকাণ্ড ব্যর্থ হবে।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, নামাজের অনুষ্ঠান থেকে আল্লাহ মুসলমানদের বিভিন্ন শিক্ষা দিতে চেয়েছেন। আর নামাজের ইমাম নির্বাচনের বিধি-বিধানের মাধ্যমে মহান আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন, সমাজের নেতা নির্বাচন করার বিধি-বিধান। তাহলে সমাজের নেতা নির্বাচনের সেই বিধি-বিধানগুলো হবে–

১. নেতা নির্বাচিত করতে হবে সকল বা অধিকাংশ ঈমানদার মুসলমানের সমর্থন তথা ভোটের মাধ্যমে।

২. সকল বা অধিকাংশ ঈমানদার মুসলমান ঐ ভোটের মাধ্যমে জানাবেন কোন্ ব্যক্তি তাদের মতে নেতা হওয়ার জন্যে পূর্বোল্লিখিত গুণাগুণের ভিত্তিতে অধিকতর যোগ্য।

৩. ঐ ভোটাভুটি হতে হবে সকল প্রকার অন্যায় প্রভাবমুক্তভাবে।

৪. নেতা নির্বাচনের এই বিধি-বিধান ইসলামের একটি মৌলিক বিধি-বিধান। অর্থাৎ নেতা নির্বাচিত ও পরিবর্তন করার ব্যাপারে ঐ বিধি-বিধানসমূহ ইচ্ছাকৃতভাবে যে অমান্য করবে, পরকালে তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম।

ঙ. নেতার আনুগত্য ও অপসারণ পদ্ধতির শিক্ষা

নামাজের ইমামের আনুগত্য করার পদ্ধতি হচ্ছে–

- ইমাম যতক্ষণ সঠিকভাবে অর্থাৎ কুরআন-সুন্নায় উল্লেখিত নীতিমালা অনুযায়ী নামাজ পরিচালনা করবেন ততক্ষণ তাকে অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে। তা না হলে নামাজ হবে না।
- ইমাম ভুল করলে, (ভয় না করে) পিছন থেকে লোকমার মাধ্যমে অর্থাৎ গঠনমূলকভাবে তাকে শোধরানোর জন্যে বলতে হবে।
- ইমাম শুধরিয়ে নিলে তার আনুগত্য বহাল রাখতে হবে।
- কোন মারাত্মক ভুল লোকমার পরও অর্থাৎ গঠনমূলক সমালোচনার পরও যদি ইমাম শুধরিয়ে না নেয়, তবে তাকে বাদ দিয়ে সকল বা অধিকাংশ মুক্তাদির ভোটের মাধ্যমে নতুন ইমাম নির্বাচন করতে হবে।

www.pathagar.com

অতএব নামাজের ইমামের আনুগত্য ও অপসারণ পদ্ধতি হতে মুসলমান সমাজের নেতার আনুগত্য ও অপসারণ পদ্ধতি হবে–

- ❑ নেতা যতক্ষণ কুরআন হাদীসে বর্ণিত সীমারেখার মধ্যে থেকে সমাজ পরিচালনা করবে, ততক্ষণ অবশ্যই তার আনুগত্য করতে হবে।
- ❑ নির্বাচিত নেতা ভুল করলে নির্ভয়ে, ভদ্র ও গঠনমূলকভাবে তার ভুল ধরিয়ে দিতে হবে।
- ❑ মারাত্মক ভুল ধরিয়ে দেয়ার পরও নেতা যদি শুধরিয়ে না নেয় তবে তাকে অপসারণ করে ভোটের মাধ্যমে নতুন নেতা নির্বাচন করতে হবে।

সুধী পাঠকবৃন্দ, চিন্তা করে দেখুন, বর্তমান মুসলিম দেশগুলোতে নামাজীরা কোথাও কি নামাজের মাধ্যমে দেয়া শিক্ষা অনুযায়ী তাদের সমাজের নেতা নির্বাচন ও তার আনুগত্য করে? যদি তারা তা করত, তবে কী অপূর্ব শান্তি-শৃঙ্খলাই না তাদের সমাজে বা দেশে স্থাপিত হত।

চ. নেতার সমাজ বা দেশ পরিচালনা পদ্ধতির ব্যাপারে শিক্ষা

নামাজের ইমামের নামাজ পরিচালনার পদ্ধতিসমূহ–

- ❑ ইমামকে কুরআন-হাদীসে বর্ণিত গণ্ডির মধ্যে থেকে নামাজ পরিচালনা করতে হবে।
- ❑ নামাজ পরিচালনার সময় ইমামকে মুক্তাদিদের সুবিধা-অসুবিধার দিকে খেয়াল রাখতে হবে। যেমন মুক্তাদিদের মধ্যে কেউ অসুস্থ বা ব্যস্ত থাকতে পারে, তাই দীর্ঘ সূরা পড়ে নামাজ লম্বা করা ঠিক নয়।

সুতরাং নামাজের শিক্ষা অনুযায়ী, মুসলিমসমাজ বা দেশের নেতার, দেশ পরিচালনা পদ্ধতি হবে–

- ❑ দেশ পরিচালনার ব্যাপারে সে স্বাধীন নয়। কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত আইন-কানুনের গণ্ডির মধ্যে থেকে তাকে দেশ চালাতে হবে।
- ❑ যুগের দাবি অনুযায়ী নতুন আইন-কানুন বানানোর দরকার হলে ইসলামের মৌলিক বিধানগুলোর আলোকে শুরা তথা আইন পরিষদের মাধ্যমে তা করতে হবে। মৌলিক বিধানগুলোর বিরোধী কোন আইন অবশ্যই বানানো যাবে না।
- ❑ দেশ পরিচালনার সময় সাধারণ নাগরিকের সুবিধা-অসুবিধা তথা কল্যাণের দিকে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে।

ছ. জামায়াতবদ্ধ বা দলবদ্ধ হয়ে কাজ করার শিক্ষা

জামায়াতে নামাজের একটি প্রধান শিক্ষা হচ্ছে জামায়াতবদ্ধ বা দলবদ্ধ হয়ে সামাজিক কর্মকাণ্ড করা।

www.pathagar.com

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেছেন–

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا وَّلاَ تَفَرَّقُوا

অর্থঃ তোমরা দলবদ্ধভাবে আল্লাহর রুজ্জুকে আঁকড়ে ধর এবং পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ো না। (আল ইমরান : ১০৩)

আল্লাহ এখানে দলবদ্ধভাবে ইসলামের কাজ করার আদেশ দিচ্ছেন অর্থাৎ জামায়াতবদ্ধ হয়ে কাজ করাকে ফরজ করে দিয়েছেন। জামায়াতে নামাজ হচ্ছে বাস্তব প্রয়োগের মাধ্যমে এই আদেশ পালনের শিক্ষা। ইসলামের সব চেয়ে বড় কাজ হচ্ছে, আল্লাহর দীনকে বিজয়ী শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে, আল্লাহর মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়ন করা। সংঘবদ্ধ বা দলবদ্ধভাবে ছাড়া সে কাজে সফল হওয়া অসম্ভব। হজরত ওমর রা. তাই বলেছেন, জামায়াতবিহীন ইসলাম নেই, নেতাবিহীন জামায়াত নেই।

জামায়াতে নামাজ, আমাদের সেই দলবদ্ধ হিসাবে কাজ করার শিক্ষাই শুধু দেয় না, দলবদ্ধ হিসাবে কাজ করে সফলকাম হতে হলে কী কী মৌলিক বিষয় অনুসরণ করতে হবে, তাও অত্যন্ত সুন্দরভাবে শিক্ষা দেয়, প্রতিদিন পাঁচবার।

নামাজের পঠিত বিষয় থেকে শিক্ষা

নামাজের কিছু নির্দিষ্ট ও অনির্দিষ্ট কালাম, তাসবীহ ও দোয়া সকল নামাজীকে পড়তে হয়। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে দুটি–

১. কালাম (কুরআন) পড়ার মাধ্যমে নামাজীকে ইসলামের মূল বা প্রথম স্তরের মৌলিক বিষয়গুলো জানা ও ভুলে না যাওয়ার ব্যবস্থা করা।

২. তাসবীহ ও দোয়ার মাধ্যমে তার সামনে দাঁড় করিয়ে নামাজীর মুখ দিয়ে কিছু স্বীকৃতি বা অঙ্গীকার আদায় করে নেয়া যাতে করে বান্দাহ নামাজের বাইরেও ঐ কথা ও স্বীকারোক্তিগুলো অনুযায়ী তার জীবন পরিচালনা করে। নামাজে আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে তাসবীহ ও দোয়ার মাধ্যমে যে কথাগুলো নামাজী বলে বা স্বীকার করে বাস্তব জীবনে যদি সেই কথা বা স্বীকারোক্তি অনুযায়ী সে কাজ না করে, তবে নামাজীর কথা ও কাজে মিল থাকে না। যারা কথা বলে একরকম আর কাজ করে অন্যরকম তাদের সম্বন্ধে আল্লাহ বলেছেন–

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لاَ تَفْعَلُوْنَ. كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللهِ أَنْ تَقُوْلُوْا مَا لاَ تَفْعَلُوْنَ.

www.pathagar.com

অর্থঃ হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা মুখে যা বল কাজে তা কর না কেন? আল্লাহর নিকট এটা অত্যন্ত ক্রোধ উদ্রেককারী বিষয় যে, তোমরা মুখে যা বলবে কাজে তা করবে না।

অই প্রত্যেক নামাজীর ভাল করে জানা দরকার, নামাজে আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে সে কী বলছে বা স্বীকার করছে। নামাজের বাইরে যদি তার কাজ সেই অনুযায়ী না হয়, তবে কুরআন বলছে, আল্লাহর অত্যন্ত ক্রোধে তাকে পড়তে হবে।

নামাজে কালাম (কুরআন) পড়া থেকে শিক্ষা

ক. সূরা ফাতেহা পড়া থেকে শিক্ষা

নামাজের প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতেহা পড়া ফরজ। একজন মুসলমান ফরজ, ওয়াজেব ও সুন্নাতে মুয়াক্কাদা ধরে প্রতিদিন ফজরে ৪. বার, জোহরে ১০ বার, আছরে ৪ বার, মাগরিবে ৫ বার, এশায় ৯ বার অর্থাৎ মোট ৩২ বার সূরা ফাতেহা পড়ে। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ না হলে নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রতিদিন ৩২ বার এই সূরাটি পড়ার ব্যবস্থা করতেন না। রাসূল সা. বলেছেন, সূরা ফাতেহা হচ্ছে কুরআনের সর্বশ্রেষ্ঠ সূরা। চলুন এখন দেখা যাক, সূরা ফাতেহাকে কেন এত গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

সূরাটিকে এত গুরুত্ব দেয়ার কারণ হচ্ছে, মুসলমানদের বিভিন্ন দলে বিভক্ত দেখে সাধারণ মুসলমানরা ইসলাম পালনের ব্যাপারে যে ভীষণ দ্বন্দ্বে পড়ে যায়, বান্দাহ এবং তার মধ্যে কথোপকথনস্বরূপ প্রার্থনার মাধ্যমে মহান আল্লাহ সে দ্বন্দ্বের সমাধান দিয়েছেন এ সূরাটির মধ্যদিয়ে।

নামাজকে বলা হয়েছে আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যবস্থা। অর্থাৎ একজন মুসলমান যখন নামাজে দাঁড়ালো, তখন সে যেন আল্লাহর সামনে দাঁড়ালো। আর এই দাঁড়ানোর পর আল্লাহর সঙ্গে সে কথোপকথন হয়, সেটিই হচ্ছে সূরা ফাতেহা।

এ ব্যাপারে সহীহ মুসলিম ও সুনান-ই-নাসাই শরীফে উল্লেখিত এবং আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত একটি হাদীসের বক্তব্যকে সামনে রেখে সূরাটির বক্তব্যগুলো এবং তা উপস্থাপনের ধরন নিয়ে চিন্তা করলে আল্লাহ ও নামাজীর মধ্যে সেই কথোপকথনটি নিম্নরূপ হবে বলে সহজে বুঝা যায়। সূরাটিতে আল্লাহর কথাগুলোকে উহ্য (Silent) রাখা হয়েছে, আর বান্দার কথাগুলো লিখা আছে।

www.pathagar.com

নামাজীর কথা

নামাজে দাঁড়িয়ে একজন নামাজী প্রথমে আল্লাহর দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে তাঁর প্রশংসা করে তিনটি কথা বলে। যথা–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ.

অর্থঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্যে–যিনি মহাবিশ্বের রব। তিনি পরম দয়ালু ও করুণাময়; বিচার দিনের মালিক।

ব্যাখ্যাঃ নামাজী বলছে, হে আল্লাহ, আমরা যে নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও এ দুনিয়ায় বেঁচে থেকে আমাদের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে পারছি এর জন্যে সকল প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য শুধু আপনি। কোন নেতা, পীর, বুজুর্গ, ডাক্তার ইত্যাদি নয়। এভাবে নামাজী তিনটি বিষয়ে আল্লাহকে স্বেচ্ছায় স্বীকৃতি দিচ্ছে। যথা–

❑ আল্লাহ হচ্ছেন মহাবিশ্বের রব

আরবী ভাষায় রব শব্দটির তিন প্রকার অর্থ হয়। যথা– ক. মনিব বা প্রভু। খ. লালন-পালনকারী বা তত্ত্বাবধায়ক। গ. আদেশদাতা, আইনদাতা, শাসক বা বিচারকর্তা। নামাজী এই সকল অর্থেই স্বেচ্ছায় আল্লাহকে স্বীকৃতি দেয়।

❑ আল্লাহ পরম দয়ালু ও করুণাময়

রোগব্যাধি ও অন্য অসংখ্য প্রতিকূলতার মধ্যে আমরা যে এ দুনিয়ায় বেঁচে আছি, এটি সত্যিই তাঁর দয়া। আর তিনি দয়া না করলে আমরা কেউই পরকালেও শান্তিতে থাকতে পারব না। তিনি মাফ করার জন্যেই বসে আছেন। শাস্তি দেয়ার জন্যে নয়। আমরা যদি কুরআনে বর্ণিত মৌলিক কাজগুলো অন্তত করতে পারি তবে তিনি ছোটখাট সব গুনাহ মাফ করে দেবেন। এ কথা পবিত্র কুরআনে তিনি অনেকবার উল্লেখ করেছেন। আল্লাহকে দয়ালু ও করুণাময় বলার মাধ্যমে নামাজী এ বাস্তব অবস্থার স্বীকৃতি দেয়।

❑ আল্লাহ বিচার দিনের মালিক

এ কথা বলে নামাজী আল্লাহকে বলছে, শেষ বিচারের দিনে সর্বময় কর্তৃত্ব থাকবে আপনার। ইসলামের মৌলিক কাজগুলো না করে গেলে সেই দিন কোন পীর, বুজুর্গ, শহীদ, এমনকি নবীও কাউকে বাঁচাতে পারবেন না। তাই রাসূল সা. নবুয়াত পেয়ে আল্লাহর নির্দেশে সম্মেলন ডেকে, সর্বপ্রথম যে দিন ইসলামের দাওয়াত দেন, সে দিন তাঁর প্রাণপ্রিয় মেয়ে ফাতেমাকেও রা. সম্বোধন করে বলেছিলেন, হে ফাতেমা, তুমি যদি আল্লাহর আনুগত্য না কর তবে সেই বিচার দিনে, তোমার পিতা আমি মুহাম্মাদও তোমাকে শাস্তি থেকে বাঁচাতে পারব না।

www.pathagar.com

আল্লাহ প্রশ্ন

নামাজীর তিনটি কথা শুনে আল্লাহ বলছেন, 'কে তুই আমার প্রশংসা করছিস? কী তোর পরিচয়?

নামাজীর জবাব

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ.

অর্থ: আমরা তোমারই দাসত্ব করি এবং তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি।

ব্যাখ্যা: আল্লাহ নামাজীর পরিচয় জানতে চাওয়াতে নামাজী বলছে, আমি সেই ব্যক্তি যে সারাক্ষণ শুধু তোমারই দাসত্ব করি এবং শুধু তোমারই কাছে সাহায্য চাই। দাসত্ব করা মানে হুকুম মানা। যা হুকুম তাই আইন আর যা আইন তাই হুকুম। তাহলে নামাজী আল্লাহকে বলছে আমি সেই ব্যক্তি, যে ২৪ ঘণ্টার জীবনে অন্য কারো নয়, শুধু তোমারই আইন মেনে চলি।

নামাজী আরো বলছে, আমি শুধু তোমার কাছে সাহায্য চাই। কারণ আমি জানি নেতা, পীর, বুজুর্গ কারোরই ক্ষমতা নেই, তোমার নিকট থেকে জোর করে কিছু আদায় করে দেয়ার। তাই পীর, বুজুর্গ বা অন্য কাউকে নজর-নেয়াজ বা অন্যভাবে ঘুষ দিয়ে খুশি করে তার দ্বারা তোমার নিকট থেকে কিছু আদায় করে নেয়ার মতবাদে আমি বিশ্বাস করি না।

আল্লাহর জিজ্ঞাসা

বেশ জানলাম তোর পরিচয়। এখন বল, তুই কী চাস?

নামাজীর উত্তর

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ.

অর্থ: আমাদের সঠিক পথ দেখাও।

ব্যাখ্যা: আল্লাহর 'তুই কী চাস' প্রশ্নের উত্তরে নামাজী একটি জিনিসইমাত্র চেয়েছে, আর তা হচ্ছে, সঠিক পথ। এখানে লক্ষণীয় হচ্ছে, যে নামাজী সঠিক পথের সন্ধান আল্লাহর কাছে চেয়েছে, সে কিন্তু নিজের কয়টি কথা বলেছে বা স্বীকার করেছে–

- ❑ সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্যে।
- ❑ আল্লাহ মহাবিশ্বের রব।
- ❑ আল্লাহ শেষ বিচার দিনের মালিক।
- ❑ চব্বিশ ঘণ্টার জীবনে সে শুধু তাঁরই আইন মেনে চলে।

www.pathagar.com

অর্থাৎ নামাজী কাফের, কমিউনিস্ট বা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী নয় বরং সে একজন পাকা ঈমানদার মুসলমান। তাহলে কেন সেই ঈমানদার মুসলমান, যে ইসলামকেই তার জীবন ব্যবস্থা হিসাবে বেছে নিয়েছে, সে আল্লাহ চাইতে বলাতে অন্য কিছু না চেয়ে শুধু সঠিক পথের সন্ধান চাইল? বেশ চিন্তার বিষয়, তাই না? আল্লাহর ও নামাজীর পরবর্তী কথোপকথনের মাধ্যমে ব্যাপারটা পরিষ্কারভাবে বুঝা যায়।

আল্লাহর জিজ্ঞাসা

নামাজীর সঠিক পথ চাওয়ার উত্তরে আল্লাহ বলেছেন, আচ্ছা বান্দা, এতক্ষণের কথাবার্তায় তো বুঝা যায়, তুই ইসলামের সঠিক পথেই আছিস। কিন্তু এরপরও তুই আমার নিকট সঠিক পথের সন্ধান চাচ্ছিস। এই সঠিক পথ বলতে তুই কী বুঝাতে চাচ্ছিস, খুলে বলতো?

নামাজীর জবাব

صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ.

অর্থ: ঐ সব লোকের পথ যাদের তুমি পুরস্কৃত করেছ এবং যারা অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্ট ছিল না।

ব্যাখ্যা: আল্লাহ সঠিক পথের ব্যাখ্যা চাওয়াতে নামাজী মুসলমান বলছে, হে আল্লাহ, সঠিক পথ বলতে আমি ঐ পথ বুঝাতে চাচ্ছি, যে পথে চলে পূর্ববর্তীরা সফলকাম হয়েছেন এবং অভিশপ্ত বা পথভ্রষ্ট হন নাই। কারণ, আমি তো ইসলাম পালনের ব্যাপারে মুসলমানদের বিভিন্ন দলে বিভক্ত দেখছি। যেমন-

- ❑ অলি-আওলিয়াদের অনুসারী দল,
- ❑ পীরদের অনুসারী দল,
- ❑ বুজুর্গদের অনুসারী দল,
- ❑ তাবলীগের অনুসারী দল,
- ❑ কংগ্রেসী, আওয়ামী, জাতীয়তাবাদী, ওলামাদের অনুসারী দল,
- ❑ অধ্যাত্মবাদীদের অনুসারী দল,
- ❑ ইসলামী রাজনৈতিক দলের অনুসারী দল ইত্যাদি।

উপরের প্রত্যেক দলের অনুসারীদের চেহারা ও বেশ-ভূষায়তো ইসলামের অনুসারী বলে মনে হয়। কাউকে কাউকেতো চেহেরা ও বেশভূষা দেখে বিরাট কামেল লোক মনে হয়। আবার কথাবার্তায় প্রত্যেকে দাবি করেন তারাই সঠিক ইসলামের পথে আছেন। তাই আমি কাদের পথ অনুসরণ করব, এ ব্যাপারে

www.pathagar.com

ভীষণ দ্বন্দ্বে পড়ে গেছি। এ জন্যে যে পথে চললে সফলকাম হব এবং তোমার গজবে পড়ব না, সেই পথের সন্ধান আমি তোমার কাছে চাচ্ছি।

নামাজীর সঠিক পথ দেখানোর প্রশ্নের জবাবে আল্লাহর উহ্য থাকা উত্তর

আল্লাহ বলছেন, বান্দাহ, ইসলামের নামে বিভিন্ন ভ্রান্ত দল-উপদলের দ্বারা যে ইসলামের ভীষণ ক্ষতি হবে, তাতো আমি জানি। আর সাধারণ মুসলমানরা যে সঠিক ইসলাম কোন্‌টি, তা বুঝতে কঠিন সমস্যায় পড়ে যাবে, তাও আমি জানি। এ সমস্যা থেকে উদ্ধারের উপায় হচ্ছে কুরআনের জ্ঞান অর্জন করা। আর এ জন্যেই আমি নিম্নোক্ত ব্যবস্থাগুলো করেছি–

- ❑ নামাজে সূরা ফাতেহার পর অন্য কোন সূরার বড় একটি বা ছোট তিনটি আয়াত পড়া বাধ্যতামূলক করেছি। যাতে মুসলমানরা কোন মতেই কুরআন ভুলে যেতে না পারে।
- ❑ সূরা ফাতেহা পরে নাযিল হওয়ার পরও কুরআনে সূরাগুলো সাজানোর সময় সূরা ফাতেহাকে প্রথমে এনেছি।
- ❑ মুমিনের সব ফরজের বড় ফরজ যে কুরআনের জ্ঞান অর্জন করা তা কুরআন-সুন্নাহের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছি।
- ❑ ইবলিস শয়তানের এক নম্বর কাজ অর্থাৎ সবচেয়ে বড় গুনাহের কাজ কুরআনের জ্ঞান থেকে দূরে রাখা তাও আমি কুরআনের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছি।
- ❑ আর সূরা আরাফের ৩ নং আয়াতে আমি স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছি–

اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ط

অর্থঃ হে লোকেরা, তোমাদের রবের তরফ থেকে যা নাযিল হয়েছে (কুরআন) শুধু তাই মেনে চল এবং এর পরিবর্তে অন্য কোন আওলিয়াকে অনুসরণ কর না।

ব্যাখ্যাঃ আল্লাহ এখানে মুসলমানদের লক্ষ্য করে বলেছেন, এমন এক সময় আসবে যখন ইসলাম পালন নিয়ে মুসলমানরা বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে যাবে। কিন্তু তোমরা শুধু অনুসরণ করবে সেই দলকে, যাদের জীবনের সকল দিক (ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, আন্তর্জাতিক ইত্যাদি) কুরআন অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে। সুধী পাঠক, চিন্তা করে দেখুন নামাজে দাঁড়িয়ে সূরা ফাতেহার মাধ্যমে প্রতিদিন অন্তত ৩২ বার আল্লাহর সঙ্গে আমাদের কী কথোপকথন হচ্ছে। কী অপূর্ব উপায়ে আল্লাহ আমাদের ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ

www.pathagar.com

কয়েকটি মৌলিক বিষয় এবং ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে নেয়ার সব থেকে মারাত্মক উপায় থেকে বাঁচার পথ বলে দিয়েছেন। আল্লাহ ইচ্ছা করলে এটি সোজাসুজি বলে দিতে পারতেন। কিন্তু মানুষরা যাতে সহজে বুঝতে পারে, তাই তিনি প্রশ্ন করে কথোপকথনের মাধ্যমে বিষয়গুলো উপস্থাপন করেছেন।

খ. সূরা ফাতেহা বাদে কুরআনের অন্য অংশ পড়া থেকে শিক্ষা

নামাজের প্রতি রাকাতে সূরা ফাতেহার পর কুরআনের অন্তত একটি বড় আয়াত বা ৩টি ছোট আয়াত অবশ্যই পড়তে হয়। কেন আল্লাহ এ বাধ্যতামূলক ব্যবস্থাটি করেছেন, তা আজ বিশ্ব মুসলমানদের আবার ভাল করে বুঝতে হবে এবং সেই অনুযায়ী তাদের কর্মপদ্ধতি শুধরিয়ে নিতে হবে, যদি তারা আবার দুনিয়ায় বিজয়ী হতে চায় এবং পরকালে শান্তিতে থাকতে চায়। ব্যাপারটি ভালভাবে বুঝতে হলে কুরআনে বর্ণিত মানুষ সৃষ্টির গোড়ার কথা থেকে শুরু করতে হবে।

আল্লাহ আদম আ. কে সৃষ্টি করে ফেরেশতাদের এবং জীন-ইবলিসকে তাকে সেজদা করতে বললেন। সকল ফেরেশতা আদম আ. কে সেজদা করল কিন্তু ইবলিস অহংকার করে সেজদা করল না। এতে আল্লাহ তাকে অভিশাপ দিয়ে শয়তান হিসাবে ঘোষণা দিলেন। ইবলিস তখন আল্লাহকে বলল, আল্লাহ, আমিও আদম ও তার বংশধরদের ইসলামের পথ থেকে বিপথে নিতে সর্বাত্মক চেষ্টা করব। আর এই কাজ করার জন্যে ইবলিস দুটো জিনিস আল্লাহর নিকট দাবি করল–

১. কেয়ামত পর্যন্ত আয়ু এবং

২. যে কোন স্থানে যাওয়ার এবং যে কোন রূপ ধারণ করার ক্ষমতা।

আল্লাহ ইবলিসকে বললেন, ঠিক আছে, তোর দুটো দাবিই আমি পূরণ করব। কিন্তু তুই জোর করে বা বাধ্য করে মানুষকে বিপথে নিতে পারবি না। শুধু ধোঁকা দিয়ে তাদের বিপথে নেয়ার চেষ্টা করতে পারবি। আল্লাহ এই কথার পরিপ্রেক্ষিতে ইবলিস তার কর্মকৌশল ঠিক করে নিল। সে ঠিক করল, যেহেতু তাকে শুধু ধোঁকাবাজি বা প্রতারণার মাধ্যমে মানুষকে ইসলাম থেকে দূরে সরানোর ক্ষমতা দেয়া হয়েছে, তাই তাকে কাজ করতে হবে, মানুষের বন্ধু বা কল্যাণকামীর ছদ্মবেশে।

আল্লাহ আদম আ. ও বিবি হাওয়াকে বেহেশতে থাকতে দিলেন এবং একটি গাছের ফল ছাড়া আর যা কিছু ইচ্ছা খেতে বললেন। ইবলিস তার কাজ শুরু করে দিল। সে বন্ধু সেজে আদম আ. এর কাছে গেল এবং বলল– আদম, জানো আল্লাহ কেন তোমাকে ঐ গাছের ফল খেতে নিষেধ করেছেন? ঐ ফল

www.pathagar.com

খেলে তুমি ফেরেশতা ও অমর হয়ে যাবে এবং চিরকাল এই বেহেশতে থাকতে পারবে, তাই আল্লাহ তোমাকে ঐ গাছের ফল খেতে নিষেধ করেছেন। এভাবে ইবলিস কল্যাণের কথা বলে আদম আ. কে নিষিদ্ধ গাছের ফল খাওয়ার জন্যে উদ্বুদ্ধ করল এবং আদম আ. ও বিবি হাওয়া কল্যাণের কথা ভেবে নিষিদ্ধ গাছের ফল খেয়ে ফেললেন। নিষিদ্ধ ফল খাওয়ার পরই কিছু নিদর্শন দেখে আদম আ. বুঝতে পারলেন অন্যায় কাজ করা হয়ে গেছে। তাই সাথে সাথে তাঁরা আল্লাহর নিকট অত্যন্ত বিনীতভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। আল্লাহ তাঁদের ক্ষমা করে দিলেন। কিন্তু জানিয়ে দিলেন, তাঁরা আর বেহেশতে থাকতে পারবে না। কিছু সময়ের জন্যে তাঁদের দুনিয়াতে থাকতে হবে এবং সেখানে শয়তানও তাঁদের সঙ্গে থাকবে। শয়তানও দুনিয়ায় তাঁদের সঙ্গে যাবে শুনে আদম আ. ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। কারণ শয়তানের ধোঁকা বুঝা যে কত কঠিন, সে অভিজ্ঞতা তাঁর ইতোমধ্যে হয়ে গেছে। তাই আদম আ. এটা ভেবে মহাচিন্তায় পড়লেন যে, শয়তান যদি পৃথিবীতে যায় তবে তো সে ধোঁকা খাটিয়ে তাঁর সকল বংশধরকে বিপথে নিয়ে যাবে। আদম আ. এর ঐ দুশ্চিন্তা বুঝতে পেরে আল্লাহ বললেন–

فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِّنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُوْنَ.

অর্থঃ অতঃপর আমার নিকট থেকে জীবন বিধান তোমাদের নিকট পৌছান হবে। যারা সেই বিধান অনুসরণ করবে তাদের কোন ভয় নেই এবং তাদের চিন্তিত হওয়ারও কোন কারণ নেই। (বাকারা : ৩৮)

ব্যাখ্যাঃ আল্লাহ আদম আ. এর চিন্তা দেখে বললেন, তোমার দুঃশ্চিন্তার কোন কারণ নেই। নবী-রাসূলদের মাধ্যমে আমি কিতাব আকারে যুগে যুগে জীবন বিধান পাঠাবো। তোমার বংশধরদের মধ্যে যারা সেই জীবন বিধান মেনে চলবে তাদের কোন ভয় নেই।

আল্লাহর এ কথা জেনেই ইবলিস মুসলমানদের ইসলাম থেকে বিপথে নেয়ার জন্যে তার এক নম্বর কাজটি ঠিক করে ফেললো। আর তা হলো, মুসলমানদের বিভিন্নভাবে আল্লাহর কিতাবের জ্ঞান থেকে দূরে রাখা। কারণ এটি করতে পারলে বন্ধু বা কল্যাণকারী সেজে, যেকোন কথা বা কাজকে ইসলামের কথা বা কাজ বলে চালিয়ে দিয়ে, অতি সহজে সে মুসলমানদের ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যেতে পারবে।

www.pathagar.com

আল্লাহও ইবলিসের ঐ এক নম্বর কর্মপন্থাকে বিফল করে দেয়ার জন্যে ব্যবস্থা নিলেন। শেষ নবীর উম্মতের জন্যে আল্লাহর সেই ব্যবস্থা হচ্ছে নামাজের প্রতি রাকাতে সূরা ফাতেহার পর কুরআনের অন্তত একটি বড় আয়াত বা তিনটি ছোট আয়াত বাধ্যতামূলকভাবে পড়া। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে আল্লাহ নিম্নোক্তভাবে মুসলমানদের শয়তানের এক নম্বর কর্মপন্থা থেকে বাঁচার ব্যবস্থা করছেন—

১. নামাজের বাইরেও প্রতিদিন কিছু কুরআন তেলাওয়াত করার শিক্ষা দেয়া। এর ফলে মুসলমানরা ইসলামের প্রথম স্তরের সকল মৌলিক বিষয় নির্ভুল তথ্য থেকে সরাসরি জানতে পারবে।

২. নামাজে পুনঃ পুনঃ (Repeatedly) পড়ার মাধ্যমে মুসলমানরা যাতে কুরআনের বক্তব্য কোনক্রমেই ভুলে যেতে না পারে, তার ব্যবস্থা করা।

পবিত্র কুরআনের মোট আয়াত সংখ্যা ৬২৩৬টি। এর মধ্যে কোন্ আয়াতগুলো সব থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ সে ব্যাপারে আল্লাহ সূরা আল-ইমরানের ৭ নং আয়াতে বলেছেন:

هُوَ الَّذِيْ أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ ط

অর্থ: তিনিই (আল্লাহ) তোমার প্রতি এ কিতাব (আল-কুরআন) নাযিল করেছেন। এতে মুহকামাত আয়াত আছে। ঐগুলো হচ্ছে কুরআনের মা।

ব্যাখ্যা: মুহকামাত আয়াত হচ্ছে কুরআনের সেই সব স্পষ্ট আয়াত যার অর্থ বুঝা খুব সহজ বা যার অর্থ বুঝতে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না। এই আয়াতগুলোর মাধ্যমে বর্ণনা করা হয়েছে ইসলামের বুনিয়াদী নীতিসমূহ। যথা : আকায়েদ (বিশ্বাস-প্রত্যয়), ইবাদাত (উপাসনা-আনুগত্য), আখলাক (নৈতিকতা-চরিত্রনীতি), ফারায়েজ (অবশ্য পালনীয় কর্তব্য) এবং আমার ও নাহী (আদেশ ও নিষেধ)। এ জন্যে এই আয়াতগুলোকে আল্লাহ কুরআনের 'মা' বলে উল্লেখ করছেন।

কুরআনের সূরা ফাতেহার ৭টি আয়াত বাদ দিলে মোট আয়াত সংখ্যা ৬২২৯টি। আর মুহকামাত আয়াতের সংখ্যা প্রায় ৫শ'টি। প্রতিদিনে ফরজ, ওয়াজিব ও সুন্নাতে মুয়াক্কাদাসহ ৩২ রাকাত নামাজের ২৫ রাকাতে সূরা ফাতেহার পরে অন্য আয়াত পড়তে হয়। প্রতি রাকাতে ১টি বা ৩টি করে আয়াত পড়লেও প্রতি ৭ থেকে ২০ দিনের মধ্যে মুহকামাত আয়াতগুলো একবার পড়া হয়ে যায়। আর প্রতি ৮৪ থেকে ২৫০ দিনের মধ্যে পুরো কুরআন পড়া হয়ে যায়। চিন্তা করে দেখুন, ইসলামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক বিষয়গুলো

www.pathagar.com

সর্বোচ্চ ৭ থেকে ২০ দিনের মধ্যে নির্ভুল উৎসের থেকে পুনঃ পড়ার (Rivision) কী অভূতপূর্ব ব্যবস্থাই না আল্লাহ করেছেন! এর মাধ্যমে আল্লাহ এটিই নিশ্চিত করতে চেয়েছেন যে, মুসলমানরা যেন তাদের জীবন-বিধানের প্রথম স্তরের মৌলিক বিষয়গুলো কোনক্রমে ভুলে যেতে না পারে। ফলে শয়তান বন্ধু বা কল্যাণকামী বেশে এসেও যেন তাদের অন্তত ঐ বিষয়গুলোর ব্যাপারে কোনক্রমেই ধোঁকা দিতে না পারে। আর কুরআন ও সুন্নাহের মাধ্যমে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন যে, ইবলিস শয়তানের ১ নং কাজই হচ্ছে মানুষকে কুরআনের জ্ঞান থেকে দূরে রাখা।

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, মহান আল্লাহর এত সব অপূর্ব ব্যবস্থাকে প্রায় ব্যর্থ করে দিয়ে ইবলিস শয়তান তার এক নম্বর কাজে আজ প্রায় ১০০% সফল। এটি শয়তান শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে করে নাই। সে তা করেছে কুরআনের জ্ঞান অর্জনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত নানা রকম ধোঁকাবাজিমূলক কথা মুসলমান সমাজ তথা মানুষের মধ্যে চালু করে দিয়ে। সে সকল ধোঁকাবাজিমূলক কথার কয়েকটি পূর্বেই (৩২পৃষ্ঠা) উল্লেখ করা হয়েছে।

নামাজে পড়া তাসবীহ থেকে শিক্ষা

নামাজে পড়া সকল তাসবীহ ও দোয়া নিয়ে আলোচনা করতে গেলে বইটির কলেবর ছোট রাখা যাবে না। তাই যে তাসবীহটি আমরা নামাজে সর্বাধিক বার পড়ি, শুধু সেটি নিয়ে কিছু আলোচনা করে পুস্তিকাটি শেষ করতে চাই।

নামাজে সর্বাধিক যে তাসবীহটি পড়তে হয় তা হচ্ছে–

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْاَعْلَى/سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ.

প্রতি ২ রাকাত নামাজে নামাজী কমপক্ষে ১৯ বার سُبْحَانَ তাসবীহটি বলেন। সানায় ১ বার, রুকুতে ৩ বার এবং ২ সিজদায় ৬ বার। অর্থাৎ প্রতিদিনে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজে কমপক্ষে ২৯৯ বার এই সুবহানা তাসবীহটি আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে নামাজীকে পড়তে হয়। আল্লাহ কি বিনা কারণে প্রতিদিন ২৯৯ বার এই কথাটি নামাজীর মুখ দিয়ে বলিয়ে নিচ্ছেন? না, তা অবশ্যই নয়। কথাটি মুসলমানদের জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই নামাজে দাঁড় করিয়ে তিনি মুসলমানদের মুখ দিয়ে ২৯৯ বার কথাটি বলিয়ে নিয়েছেন। চলুন এবার দেখা যাক, আল্লাহ সুবহানা শব্দটির দ্বারা নামাজীর মুখ দিয়ে কী স্বীকার করিয়ে নিচ্ছেন।

www.pathagar.com

সুবহানা শব্দটির শাব্দিক অর্থ হচ্ছে পবিত্র। কুরআনে যত আয়াতে সুবহানা শব্দটি আছে, সেগুলো পর্যালোচনা করলে বুঝা যায়– এই শব্দটি দ্বারা আল্লাহ বুঝাতে চেয়েছেন, তিনি শিরক থেকে পবিত্র। তাই তাসবীহটির মাধ্যমে নামাজী আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে স্বীকৃতি দিচ্ছে যে, আল্লাহ শিরক থেকে পবিত্র। অর্থাৎ নামাজে আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে প্রতিটি নামাজী দিনে ২৯৯ বার অঙ্গীকার করছে যে, বাস্তব জীবনে সে শিরক করবে না। আল্লাহ জানেন, শিরক দুনিয়া ও আখিরাতের জন্যে অত্যন্ত ক্ষতিকর একটি বিষয়। তাই তিনি প্রতিদিন ২৯৯ বার কথাটি নামাজীর কাছ থেকে স্বীকার করিয়ে নিয়ে এ তথ্যটিই বলতে চেয়েছেন যে, তারা যেন তাদের বাস্তব জীবনে শিরকের গুনাহ থেকে অবশ্যই মুক্ত থাকে।

তাহলে শিরক কী এবং কী কী কাজ করলে শিরক করা হয়, প্রতিটি মুসলমানের এ ব্যাপারে অত্যন্ত পরিষ্কার ধারণা থাকা দরকার। শিরক শব্দের অর্থ হচ্ছে অংশীদারিত্ব। তাই আল্লাহর সাথে শিরক করার অর্থ হচ্ছে, যে সব বিষয় শুধুমাত্র আল্লাহর জন্যে নির্ধারিত, সে সব বিষয়ে অন্য কারো অংশীদারত্ব আছে এ কথা স্বীকার করা অথবা বাস্তবে এমন কাজ করা যাতে বুঝা যায়, ঐ সব বিষয়ে আল্লাহর সঙ্গে অন্যের অংশীদারত্ব স্বীকার করে নেয়া হয়েছে।

চলুন এবার দেখা যাক, শিরক কয় প্রকার এবং বর্তমানকালে মুসলমানরা কোন্ কোন্ শিরক কী পরিমাণে করছে–

শিরকের শ্রেণীবিভাগ

১. আল্লাহর সত্তার সাথে শিরক

এটি হচ্ছে আল্লাহ একের অধিক বা তাঁর স্ত্রী, ছেলে, মেয়ে ইত্যাদি আছে এ কথা বলা বা স্বীকার করা। মুসলমানরা এ ধরনের শিরক থেকে মুক্ত বলা চলে।

২. আল্লাহর গুণাবলীর সাথে শিরক

এটি হচ্ছে, যে সকল গুণ শুধুমাত্র আল্লাহর জন্যে নির্ধারিত, সে গুণ অন্য কারো আছে এটি বলা, স্বীকার করা বা সে অনুযায়ী কাজ করা। যেমন– সব জায়গায় উপস্থিত থাকা, সব কথা শুনতে পাওয়া, গায়েব জানা ইত্যাদি গুণ শুধুমাত্র আল্লাহর জন্যে নির্ধারিত। অন্য কোন ব্যক্তি বা সত্তার এই রকম গুণ আছে, এটি মনে করা বা সেই অনুযায়ী কাজ করা শিরক। চাই সে ব্যক্তি বা সত্তা জীবিত বা মৃত কোন নবী-রাসূল আ., অলি-আউলিয়া, পীর, বুজুর্গ বা অন্য কেউ হোক না কেন। এ ধরনের শিরক বর্তমানকালের মুসলমানদের মধ্যে বেশ দেখা যায়।

৩. আল্লাহর হক বা অধিকারের সাথে শিরক

যে সকল জিনিস পাওয়ার হক শুধুমাত্র আল্লাহর তা অন্য কাউকে দিলে বা অন্য কারো তা পাওয়ার হক আছে –এ কথা স্বীকার করলে শিরক করা হবে। যেমন,

www.pathagar.com

সেজদা পাওয়ার হক শুধুমাত্র আল্লাহর। তাই কেউ যদি কোন মাজারে বা অন্য কোথাও গিয়ে আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সেজদা করে, তবে সে শিরক করল। এ ধরনের শিরক মুসলমানদের মধ্যে বর্তমানে কম হলেও আছে।

৪. আল্লাহর ক্ষমতার সাথে শিরক

ক. আল্লাহর সাধারণ ক্ষমতার সাথে শিরক

হায়াত-মউত, রিজিক, ধন-দৌলত, সম্মান, সন্তান-সন্ততি ইত্যাদি দেয়া এবং গুনাহ মাফ করার ক্ষমতা শুধু আল্লাহর। পৃথিবীর জীবিত বা মৃত কোন ব্যক্তি বা সত্তার আল্লাহর নিকট থেকে ঐগুলো জোর করে এনে দেয়ার বিন্দুমাত্র ক্ষমতা নেই। কেউ যদি মনে করে জীবিত বা মৃত কোন ব্যক্তি বা সত্তার, আল্লাহর নিকট থেকে জোর করে বা আল্লাহকে বাধ্য করে অথবা ইচ্ছে করলেই আল্লাহকে অনুরোধ করে ঐগুলো আদায় করে দেয়ার ক্ষমতা রাখে, তাহলে নিঃসন্দেহে আল্লাহর ক্ষমতার সঙ্গে শিরক করা হবে। মানুষ ক্ষমতাবান কোন ব্যক্তির নিকট থেকে কিছু পাওয়ার আশায় দ্বিতীয় কোন ব্যক্তির পিছনে অর্থ-সম্পদ বা শ্রম তখনই শুধু ব্যয় করে, যখন সে মোটামুটি নিশ্চিত হয় যে, দ্বিতীয় ব্যক্তি খুশি হয়ে চেষ্টা করলে ক্ষমতাবান ব্যক্তি বা সত্তার নিকট থেকে তার কাঙ্ক্ষিত বস্তুটি অবশ্যই এনে দিতে পারবে। তদ্রূপ, আল্লাহর নিকট থেকে কিছু পাওয়ার আশায় জীবিত বা মৃত কোন ব্যক্তিকে (পীর, বুজুর্গ, দরবেশ ইত্যাদি) নজর-নিয়াজ বা শ্রম (হাত-পা টিপা) মানুষ শুধু তখনই দেয়, যখন সে বিশ্বাস করে, ঐ ব্যক্তি খুশি হয়ে চেষ্টা করলে তার কাঙ্ক্ষিত বস্তুটি আল্লাহর নিকট থেকে অবশ্যই এনে দিতে পারবে। এটি অবশ্যই শিরক। বর্তমান মুসলমানসমাজে এই ধরনের শিরক কম-বেশি চালু আছে।

খ. আল্লাহর আইন বানানোর ক্ষমতার সাথে শিরক

পবিত্র কুরআনের সূরা ইউসুফের ৪০ নং আয়াতে আল্লাহ বলছেন—

ان الْحُكْمُ الاَّ لِلّٰهِ.

অর্থ: হুকুম করার ক্ষমতা শুধুমাত্র আল্লাহর।

ব্যাখ্যা: মহান আল্লাহ এই আয়াত ও আরো আয়াতের মাধ্যমে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা দিচ্ছেন যে, হুকুম করার ক্ষমতা শুধুমাত্র তাঁর। হুকুম মানে আইন, আবার আইন মানে হুকুম। তাহলে আল্লাহ এখানে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করছেন যে, আইন বানানোর সার্ব্বভৌম বা স্বাধীন ক্ষমতা শুধু তাঁর। পৃথিবীর আর কোন সত্তার আইন বানানোর ব্যাপারে সার্বভৌম বা স্বাধীন ক্ষমতা নেই। চাই সে সত্তা আইন পরিষদ (Parliament), সিনেট, হাউজ অব কমন্স, হাউজ

www.pathagar.com

অব লর্ডস, লোকসভা, প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী, বাদশাহ যেই হোক না কেন। এই সব সত্তার আইন প্রণয়নের ব্যাপারে ক্ষমতা শুধু এতটুকু যে, যে সকল ব্যাপারে আল্লাহ কোন স্পষ্ট আইন দেননি, সেগুলোর ব্যাপারে আইন প্রণয়ন করা। কিন্তু তা অবশ্যই আল্লাহর দেয়া কোন স্পষ্ট আইনের পরিপন্থী হতে পারবে না। কেউ যদি ঐ সব সংস্থা বা সত্তা আইন প্রণয়নের ব্যাপারে স্বাধীন ক্ষমতার অধিকারী, এ কথা ভোট বা সমর্থনের মাধ্যমে স্বীকার করে নেয় বা তাদের বানানো (আল্লাহর আইনের বিরোধী) আইনকে খুশি মনে মেনে চলে, তবে সে অবশ্যই আল্লাহর আইন বানানোর ক্ষমতার সাথে শিরক করল।

মানুষের জীবন পরিচালনার আইনগুলো বানিয়ে আল্লাহ তা জানিয়ে দিয়েছেন পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে। আর রাসূল সা. সেগুলো বাস্তবে রূপদান করে মানুষকে দেখিয়ে দিয়েছেন। তাই কুরআনে বলা আছে, এমন হুকুম বা আইনের পরিপন্থী কোন আইন বানানোর ক্ষমতা কোন সত্তা বা সংস্থার নেই। যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা এরকম আইন প্রণয়ন করে এবং তা মানুষকে মানতে বাধ্য করে, কুরআনের ভাষায় তাদের বলা হয়েছে 'তাগুত'। এটি হচ্ছে ইসলামকে অস্বীকার করার (কুফরীর) সাধারণ পর্যায়ের চেয়ে খারাপ পর্যায়। আর যে সব মুসলমান ইসলাম বিরোধী আইন প্রণয়নের জন্যে ভোট বা সমর্থনের মাধ্যমে তাগুতকে ক্ষমতায় বসায় বা খুশি মনে তাগুতের বানানো আইন মেনে চলে, তারা নিঃসন্দেহে নিজেদের ঐ পর্যায়ের কুফরীর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করে।

এটিই হচ্ছে সেই শিরক, যেটি বর্তমান বিশ্বে মুসলমানরা সব চেয়ে বেশি করছে। বর্তমানে বিশ্বের মুসলিম দেশগুলোর ২/১টি ছাড়া সব ক'টিতে কুরআন বিরোধী আইন চালু আছে। অধিকাংশ মুসলমান সমর্থন করেছে বলেই এটি চালু হতে পেরেছে। আর বেশির ভাগ মুসলমান খুশি মনে মেনে চলছে বলে এটি চালু থাকতে পারছে। তাই না বুঝে হোক, আর বুঝে হোক পৃথিবীর অধিকাংশ মুসলমান আজ এই শিরকটি করছে, এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই।

কুরআনে বর্ণিত আইন-কানুন বা বিধি-বিধানগুলো যে কত যুক্তিসঙ্গত মানবকল্যাণমূলক তা যে কেউ একটু মনোযোগ দিয়ে পড়লে এবং চিন্তা করলেই বুঝতে পারবেন। ঐ বিধি-বিধানগুলোর মাত্র ১৪টি উল্লেখ করেছি 'পবিত্র কুরআন অনুযায়ী নবী-রাসূল প্রেরণের উদ্দেশ্য এবং তাঁদের সঠিক অনুসরণের মাপকাঠি' নামক বইয়ে। ঐ ১৪টি বিধানও যদি সঠিকভাবে কোন দেশে চালু করা যায়, তবে সে দেশটি যে একটি শান্তিময় দেশ হয়ে যাবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

www.pathagar.com

নামাজে পড়া অন্যান্য তাসবীহ ও দোয়া থেকে শিক্ষা

নামাজে পড়া অন্যান্য তাসবীহ ও দোয়ার মাধ্যমেও আল্লাহ নামাজীর মুখ দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা বলিয়ে বা স্বীকার করিয়ে নেন। তাই প্রতিটি নামাজীর নামাজে পড়া প্রতিটি তাসবীহ ও দোয়ার অর্থ ও ব্যাখ্যা ভাল করে জানা ও বুঝা উচিত এবং তাদের দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডেও তার প্রতিফলন হওয়া উচিত। অন্যথায় আল্লাহর শাস্তি থেকে তাদের কেউই উদ্ধার করতে পারবে না।

কালেমা, নামাজ, রোজা, হজ্জ ও যাকাত নামক উপাসনামূলক ইবাদাতগুলো এবং মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্যের মধ্যে সম্পর্ক

বর্তমান বিশ্বে মুসলমানদের দুরবস্থার অন্যতম প্রধান একটি কারণ হচ্ছে, কালেমা, নামাজ, রোজা, হজ্জ ও যাকাত এ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপসনামূলক ইবাদাত এবং আল্লাহর মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য– এ দুটো বিষয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক না জানা বা না বুঝা অথবা এ ব্যাপারে অস্পষ্ট ধারণা।

মানুষ সৃষ্টির আল্লাহর উদ্দেশ্য হচ্ছে, 'আল্লাহর সন্তুষ্টিকে সামনে রেখে কুরআনে বর্ণিত সকল ন্যায়ের বাস্তবায়ন ও অন্যায়ের প্রতিরোধের মাধ্যমে মানুষের কল্যাণ করা'। এটি 'পবিত্র কুরআন-হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য' শিরোনামের বইটিতে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি। মানুষ সৃষ্টির এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের একমাত্র পথ হচ্ছে, ইসলামী জীবনব্যবস্থাকে বিজয়ীশক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা। আর এটিই হচ্ছে, নবী-রাসূল আ. পাঠানোর আল্লাহর উদ্দেশ্য। এ বিষয়টি 'পবিত্র কুরআন-হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী নবী-রাসূল আ. পাঠানোর উদ্দেশ্য এবং তাঁদের সঠিক অনুসরণের মাপকাঠি' নামক বইতে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

সুধী পাঠক, আমরা মানুষেরা যখন কোন উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের পরিকল্পনা করি তখন প্রথমে ঐ উদ্দেশ্য সাধনের উপযোগী লোক তৈরি করার জন্যে একটি প্রোগ্রাম তৈরি করি। এ বক্তব্য যে চিরসত্য (Eternal Truth), তা আশা করি কেউ অস্বীকার করবেন না। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি আরো পরিষ্কার হবে। ধরুন, 'দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করা'। পৃথিবীতে যত সরকার আছে তাদের সবারই এটি একটি প্রধান উদ্দেশ্য। আর এই উদ্দেশ্য সুষ্ঠুভাবে সাধন করার জন্যে, পৃথিবীর সকল সরকারই উপযুক্ত প্রোগ্রামের মাধ্যমে একটি দক্ষ বাহিনী গড়ে তোলে, যাকে সেনাবাহিনী বলা হয়। ঠিক এভাবেই, পৃথিবীর মানুষ যখনই কোন উদ্দেশ্য সাধন করতে চেয়েছে, তখনই প্রথমে সে উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে উপযুক্ত প্রোগ্রামের মাধ্যমে যোগ্য লোক বা জনশক্তি তৈরি করেছে।

www.pathagar.com

আল্লাহর সন্তুষ্টিকে সামনে রেখে কুরআনে বর্ণিত সকল ন্যায়ের বাস্তবায়ন ও অন্যায়ের প্রতিরোধ করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। এই কঠিন কাজটি করার জন্যেও তাহলে অবশ্যই আগে উপযুক্ত লোক তৈরি করা দরকার। কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে মানুষের জ্ঞানে যদি এ বুদ্ধি এসে থাকে, তবে সেই মানুষের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর জ্ঞানে এ বুদ্ধি আসে নাই —এ কথা চিন্তা করাও মহাপাপ। তাই আল্লাহ যে উদ্দেশ্যে মানুষ সৃষ্টি করেছেন, সেই উদ্দেশ্য সাধনের উপযোগী লোক তৈরি করার প্রোগ্রামও তিনি অবশ্যই দিয়েছেন। আল্লাহর সেই প্রোগ্রাম হচ্ছে— কালেমা, নামাজ, রোজা, হজ্জ ও যাকাত। এই পাঁচটি আনুষ্ঠানিক ইবাদাতের প্রতিটির উদ্দেশ্য জেনে, তার অনুষ্ঠানটি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে তা থেকে আল্লাহর দিতে চাওয়া শিক্ষাগুলো যদি মানুষ বুঝে-শুনে, মানে-প্রাণে গ্রহণ করে এবং তারপর সেই শিক্ষাকে তাদের ব্যক্তি ও সমাজজীবনে প্রয়োগ করার জন্যে প্রস্তুত হয়ে যায়, তবেই এমন লোকবল তৈরি হবে, যারা আল্লাহর মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের উপযোগী হবে। এটিই হচ্ছে কুরআন অনুযায়ী মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্যের সঙ্গে কালেমা, নামাজ, রোজা, হজ্জ ও যাকাতের সম্পর্ক।

মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য এবং এই পাঁচটি আমলের মধ্যকার এই সম্পর্ক বুঝে নিয়ে মুসলমানরা যতদিন এই আমলগুলো করেছিল এবং তাদের সকল কর্মকাণ্ড সে অনুযায়ী পরিচালনা করেছিল, ততদিন তারা পৃথিবীতে সকল দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ ও বিজয়ী ছিল। পরবর্তীতে ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের ব্যাপারে কুরআনের পরিবর্তে ব্যক্তিবিশেষের ওপর নির্ভরশীল হওয়ার দরুন, অধিকাংশ সাধারণ মুসলমান তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য, সেই উদ্দেশ্য সাধনের পথ এবং এর সঙ্গে এই পাঁচটি আমলের সম্পর্ক, এ সব কিছুর ব্যাপারে কুরআনে বর্ণিত বক্তব্য থেকে অনেক দূরে সরে গিয়েছে। তাই মুসলমানদের যদি আবার পৃথিবীতে সব দিকে শ্রেষ্ঠ ও বিজয়ী হতে হয়, তবে আবার তাদের ঐ সব ব্যাপারে কুরআনের দিকে ফিরে আসতে হবে। এ রকম যে এক সময় হবে, তা আল্লাহ জানতেন, তাই তিনি কুরআনের সূরা আরাফের ৩ নং আয়াতে তাঁর চিরন্তন বক্তব্যে বলেছেন :

اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ط

অর্থ: হে লোকেরা, তোমাদের রবের তরফ থেকে তোমাদের প্রতি যা কিছু নাযিল করা হয়েছে, তাই মেনে চল এবং ঐগুলোকে বাদ দিয়ে অন্যকোন আউলিয়াদের (অভিভাবকদের) অনুসরণ কর না।

ব্যাখ্যা: বক্তব্যটি এত সুস্পষ্ট যে ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় না। কুরআনের বেশির ভাগ বক্তব্য এই রকম স্পষ্ট। আল্লাহ বলেছেন যে, তোমাদের জীবন পরিচালনার ব্যাপারে যে সকল মৌলিক বিষয় আমি কিতাবে (কুরআনে) উল্লেখ করেছি, শুধু

www.pathagar.com

সেগুলো অনুসরণ কর। এর পরিবর্তে কোন ওলি, পীর, দরবেশ, বুজুর্গ, মাওলানা, মুরব্বি, চিন্তাবিদ, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি কাউকেই অনুসরণ কর না। অর্থাৎ তারা যদি কুরআন অনুযায়ী কথা বলে, তবে তা তোমরা শুনবে ও মানবে। আর তা না হলে তাদের মনগড়া কথা কোনক্রমেই মানবে না।

আনুষ্ঠানিক উপাসনাগুলোর মধ্যে নামাজকে অনেক বেশি গুরুত্ব দেয়ার কারণ

আনুষ্ঠানিক উপাসনাগুলোর থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষাগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, নামাজের অনুষ্ঠান থেকে বাস্তবভাবে যত ব্যাপক শিক্ষা দিতে চাওয়া হয়েছে অন্য চারটি থেকে তা নয়। ঐ শিক্ষাগুলোই যদি কোন ব্যক্তি বা সমাজজীবনে বাস্তবে উপস্থিত থাকে তবে সেখানে ইসলাম বিরুদ্ধ কোন কাজ উপস্থিত থাকতে পারে না এবং সে সমাজ একটি সুখী, সমৃদ্ধ, সুশৃঙ্খল ও প্রগতিশীল সমাজ হতে বাধ্য। আর তাইতো আল্লাহ নামাজের উদ্দেশ্য বলেছেন মানুষের ব্যক্তি ও সমাজজীবন থেকে ইসলামের দৃষ্টিতে অশ্লীল ও অন্যায় কাজ দূর করা।

কোন সমাজ থেকে ইসলামের দৃষ্টিতে অশ্লীল ও নিষিদ্ধ বিষয়গুলো দূর হয়ে গেলে সে স্থান শূন্য থাকবে না। সে স্থান ইসলামের দৃষ্টিতে সিদ্ধ ও অশ্লীল নয় এমন কাজে ভরপুর হয়ে যাবে। অর্থৎ কোন ব্যক্তি ও সমাজে নামাজের উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন হয়ে গেলে সেখানে আল্লাহর মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হয়ে যাবে। কারণ পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে আল্লাহর মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য হচ্ছে 'আল্লাহর সন্তুষ্টিকে সামনে রেখে কুরআনে বর্ণিত সকল ন্যায়ের বাস্তবায়ন ও অন্যায়ের প্রতিরোধের মাধ্যমে মানুষের কল্যাণ করা।' আর এ জন্যেই নামাজকে ইসলামী জীবনবিধানে অনেক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

নামাজ এবং রাসূল সা., সাহাবায়ে কিরাম ও ইসলামের প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের ব্যক্তি ও সামাজিক অবস্থা

রাসূল সা., সাহাবায়ে কেরাম ও ইসলামের প্রাথমিক যুগের মুসলমানরা যে নামাজকে শুধু অনুষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে পালন করেননি বরং নামাজের প্রতিটি অনুষ্ঠান নিষ্ঠার সঙ্গে করে তা থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষাগুলো নিয়ে সে শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজজীবনে সুনিপুণভাবে প্রয়োগ করেছিলেন, তা সহজেই বুঝা যায় উনাদের সময়কার ব্যক্তি ও সমাজের অবস্থা পর্যালোচনা করলে। উনাদের ব্যক্তি ও সমাজ থেকে ইসলামের দৃষ্টিতে যে সকল কাজ অশ্লীল ও নিষিদ্ধ, তা যে সমূলে উৎপাটিত হয়ে গিয়েছিল, তা সে সময়কার ইতিহাস যিনি জানেন তিনিই এক বাক্যে স্বীকার করবেন।

www.pathagar.com

শেষ কথা

রাসূল সা. ও সাহাবায়ে কেরামগণ দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পর কয়েকশত বছর পর্যন্ত নামাজের শিক্ষা অনুযায়ী মুসলমানদের ব্যক্তি ও সমাজজীবন চলেছিল। তারপর ধীরে ধীরে নামাজের শিক্ষাগুলোর গুরুত্ব কমিয়ে তার অনুষ্ঠানকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে বেশি। বর্তমান মুসলিমবিশ্বে নামাজ শুধু একটি অনুষ্ঠানসর্বস্ব ইবাদাত বা কাজ। নামাজের অনুষ্ঠানটি সঠিকভাবে মুসলমানদের শিক্ষা দেয়ার ব্যাপারে মক্তব, মাদ্রাসা, মসজিদ, তাবলীগ জামাত, বিভিন্ন ইসলামী দল নানাভাবে চেষ্টা করে থাকে। এটি অবশ্যই দরকার। কিন্তু পাশাপাশি যখন দেখি, নামাজের শিক্ষাগুলো সম্বন্ধে একেবারেই কোন জ্ঞান দেয়া হচ্ছে না বা আলোচনা করা হচ্ছে না, তখন শুধু অবাকই হই না, মনটা অত্যন্ত দুঃখ ভারাক্রান্তও হয়ে যায়, শয়তানের কৃতকার্যতা দেখে। কারণ, সূরা বাকারার ১৭৭ নং আয়াতে আল্লাহ অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন, নামাজকে শুধু অনুষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে পালন করাতে কোন সওয়াব নেই। ভাবতেও অবাক লাগে, কুরআনের এত গুরুত্বপূর্ণ ও অত্যন্ত যুক্তিগ্রাহ্য একটি বক্তব্য, কিভাবে মুসলমানদের চোখ এড়িয়ে (Overlook) গেল বা কিভাবে তারা এটিকে অগ্রাহ্য করল!

তাই নামাজ নামের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমলটি পালন করে বর্তমান বিশ্ব মুসলমানদের যদি সওয়াব পেতে হয় বা নামাজকে ব্যর্থতার অবস্থা থেকে ফিরিয়ে আনতে হয় বা নামাজের মাধ্যমে তাদের দুনিয়া ও আখিরাতের জীবনে শান্তি আনতে হয়, তবে সকলকে অবশ্যই নিম্নের শর্তগুলো পূরণ করতে হবে–

১. আল্লাহর সন্তুষ্টিকে সামনে রেখে নামাজ আদায় করতে হবে।
২. নামাজের কুরআনে বর্ণিত উদ্দেশ্যটি জানতে হবে এবং নামাজ আদায়ের মাধ্যমে সে উদ্দেশ্য সাধিত হচ্ছে কিনা বা হবে কিনা, তা সকল সময় খেয়াল রাখতে হবে।
৩. নামাজের অনুষ্ঠানটিকে পাথেয় অর্থাৎ নামাজের উদ্দেশ্য সাধনের মাধ্যম মনে করে পালন করতে হবে।
৪. নামাজের প্রতিটি অনুষ্ঠান আরকান-আহকাম মেনে নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতে হবে।
৫. প্রতিটি অনুষ্ঠান থেকে মহান আল্লাহর দিতে চাওয়া শিক্ষাগুলো বুঝে বুঝে মনে-প্রাণে গ্রহণ করতে হবে।
৬. সে শিক্ষা নামাজের উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে ব্যক্তি ও সমাজজীবনে 'কায়েম' করতে হবে।

পুস্তিকায় কোন ভুল-ত্রুটি ধরা পড়লে সকল পাঠকের ঈমানী দায়িত্ব আমাকে তা ধরিয়ে দেয়া এবং আমার ঈমানী দায়িত্ব সে তথ্য সঠিক হলে ভুল শুধরিয়ে পরবর্তী সংস্করণে তা ছাপানো।

মহান আল্লাহ মুসলমান জাতিকে আবার নামাজকে কায়েম করার তৌফিক দান করুন –এ দোয়া করে এবং আপনাদের দোয়া চেয়ে শেষ করছি। আল্লাহ হাফিজ!

সমাপ্ত

www.pathagar.com